POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

'বাকি রহিল তাহাদের বিষয় যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পুণ্য কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।'

(আলে ইমরান, আয়াত: ৫৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 14

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 এপ্রিল, 2019 27 রজব 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সফলতা নির্ভর করে অবিচলতার উপর। আর তা হল আল্লাহকে চেনা এবং কোন পরীক্ষা ও পতনের সম্মুখীন হতে ভয় না পাওয়া। এর পরিণামে আবশ্যিকভাবে নবীদের ন্যায় সে ঐশী বাক্যালাপ ও সম্ভাষণ লাভ করবে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

অবিচলতা

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আনকাবুত, আয়াত: ৭০) অর্থাৎ আমাদের পথে সাধনাকারীরা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। এর অর্থ এই যে, এই পথে খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের সঙ্গে সংগ্রামে যোগ দিতে হবে। এক-দুই ঘন্টা সংগ্রামে যোগ দিয়ে পলায়ন করাকে সংগ্রাম বলা যায় না, বরং তার কাজ হল জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। অতএব মুত্তাকির বৈশিষ্ট হল অবিচলতা প্রদর্শন করা। যেরূপ বলা হয়েছে, اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا (হা-মিম সিজদা, আয়াত: ৩১) অর্থাৎ যারা বলেছে, আল্লাহ্ আমাদের রব, অতঃপর তারা অবিচলতা প্রদর্শন করেছে এবং সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহকে সন্ধান করেছে। এর অর্থ এই যে, সফলতা নির্ভর করে অবিচলতার উপর। আর তা হল আল্লাহকে চেনা এবং কোন পরীক্ষা ও পতনের সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে ভীত না হওয়া। এর পরিণামে সে আবশ্যিকভাবে নবীদের ন্যায় ঐশী বাক্যালাপ ও সম্ভাষণ লাভ করবে।

ওলী বা সাধক হওয়ার জন্য পরীক্ষা আবশ্যক

অনেক মানুষ এখানে আসে যারা মন্ত্রবলে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার এবং খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার আশা রাখে। এমন ব্যক্তি উপহাস করে। তাদের উচিত নবীদের অবস্থা পর্যবেক্ষন করা। এই যে কথিত আছে যে, কোন এক ওলী বা সাধকের কাছে গিয়ে নিমেষেই কয়েক শতক ব্যক্তি সাধকে পরিণত হয়েছে- এটি সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (আনকাবুত, আয়াত: ৩) অর্থাৎ যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত না হয়, সে কিভাবে সাধক হতে পারে?

একদা বায়াজিদ এক বৈঠকে মানুষকে উপদেশ বাণী শোনাচ্ছিলেন। সেখানে সাধককূলের এক উত্তরসূরীও উপস্থিত ছিল, যে বায়াজিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। আল্লাহ্ তা'লার রীতি হল পুরোনো বংশ ত্যাগ করে নতুন বংশকে গ্রহণ করা। যেরূপে তিনি বনী ইসরাঈলকে বর্জন করে বনী ইসমাঈলকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, তারা জাগতিক ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে খোদাকে ভুলে বসে। وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (আলে ইমরান, আয়াত: ১৪১) যাইহোক সেই ব্যক্তির মনে এই ভাবনার উদয় হয় যে, বায়াজিদ এক নিম্নবর্গের পরিবারের মানুষ। কি করে সে এমন অলৌকিক নিদর্শন পুরুষ হয়ে উঠল যে, দলে দলে মানুষ তার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে, অথচ আমার দিকে কেউ আসছে না! এ বিষয়টি খোদা তা'লা বায়াজিদকে জানিয়ে দেন। তখন তিনি কাহিনী রূপে বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন যে, এক স্থানে কোন এক বৈঠকে রাত্রিতে পানি মিশ্রিত তেলের সাহায্যে একটি প্রদীপ জ্বলছিল। তেল ও পানির মধ্যে বিতণ্ডা বাধে। পানি তেলকে বলে তুই আমার থেকে ভারি ও নোংরা। আর ভারি হওয়া সত্ত্বেও আমার উপরে ভাসতে থাকিস। আমি এক বিশুদ্ধ বস্তু। আমার দ্বারা পরিচ্ছন্নতা আসে। কিন্তু নীচে থাকি। এর কারণ কি? তেল উত্তর দেয়, আমি যেরূপ চরম কষ্ট ভোগ করেছি, তুই তার একাংশও ভোগ করিস নি। এই কারণেই আমি আজ উচ্চতর স্থান লাভ করেছি। এক সময় আমাকে জমিতে বপন করা হল, আমি ভূ-পৃষ্ঠে সুপ্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি বিনয়ী হয়ে ছিলাম। অতঃপর খোদার ইচ্ছায় আমি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকলাম। আর আমার বৃদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকতেই আমাকে কেটে ফেলা হল। একের পর এক যন্ত্রনা লাভের পর আমাকে পরিশুদ্ধ করে তোলা হল। এমনকি আমাকে কলুতে পেষাই করা হল। এরপর আমি তেলে পরিণত হলে আগুন লাগানো হল। এত সব কিছুর পরও কি আমি উচ্চতর স্থান লাভ করতাম না?

এই উপমার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, খোদা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন পরীক্ষা এবং বিপদাপদের পর অবশেষে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। এমন মতবাদ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ যাতে বলা হয় যে, অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির কাছে কোন সাধনা সংগ্রাম ও শুদ্ধিকরণ ছাড়াই সত্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কুরআন শরীফে দেখ, তোমাদের উপর নবীদের ন্যায় বিপদাপদ ও পরীক্ষা না আসা পর্যন্ত কিভাবে খোদা তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন? যারা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে একথাও বলেছেন- حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (বাকারা, আয়াত: ২১৫) আল্লাহ্‌র বান্দারা চিরকালই পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে, অতঃপর খোদা তাদেরকে গ্রহণ করেছেন।

উন্নতির দুটি পথ

অধ্যাত্মিক অন্বেষণ

সুফিগণ উন্নতির দুটি পথের কথা উল্লেখ করেছেন। এক-আধ্যাত্মিক অন্বেষণ, দুই- আধ্যাত্মিক আকর্ষণ। আধ্যাত্মিক অন্বেষণ হল নিজেরা বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথ অবলম্বন করা। যেরূপ বলা হয়েছে; قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আলে ইমরান, আয়াত: ৩২) অর্থাৎ যদি তোমরা খোদার প্রীতি লাভ করতে চাও, তবে রসুলে আকরম (সা.)-এর আনুগত্য কর। তিনি হলেন পরিপূর্ণ হেদায়াতদাতা রসুল, যিনি সেই সমস্ত কষ্ট ভোগ করেছেন পৃথিবীতে যার নজির নেই। তিনি একটি দিনের জন্যও স্বাচ্ছন্দ পান নি। বস্তুত: আনুগত্যকারীরাও সেই সব মানুষই হবেন যারা নিজেদের অনুসরণযোগ্য রসুলের প্রতিটি কথা ও কাজকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সংগ্রাম করবে। সেই প্রকৃত আনুগত্যকারী, যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আনুগত্য করবে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যা কিছু আমার তা আপনারই। খোদার কসম, আপনি আমার কাছ থেকে যে জিনিসই গ্রহণ করেন, তা আমার কাছে রয়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমাকে বেশি আনন্দ দেয়।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তমান প্রতীক মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবাগণ।

হযরত খালেদ বিন কায়েস, হযরত হারেসা বিন হাযামা, হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা, হযরত হারিসা বিন নুমান, হযরত বশীর বিন সাদ রাযিআল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু-র পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

কুরআন করীমের শিক্ষার অনুসারে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বাণীর আলোকের হিবা এবং উত্তরাধিকার-এর মধ্যে পার্থক্য এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা।

এ নির্দেশ ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়, বরং বড় বা মূল্যবান জিনিস সম্পর্কে, যে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করলে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

যে ওসীয়্যত বা হেবা সন্তানের জন্য না হয়ে ধর্মের জন্য হয় তা বৈধ।

সাকেফা বনু সায়েদায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

এই পুরো ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, আনসার ও মুহাজির সকলে ইসলামের স্বার্থ নিয়েই চিন্তিত থাকতেন।

বাংলাদেশে দুর্বৃত্তপরায়ণ বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আহমদীদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাটের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। বিশেষ দোয়ার আবেদন।

খিলাফতের প্রতি অনুরাগী, নামায রোযার বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ, দোয়াগো, বিনয়ী এক মহিলা মাননীয়া সিদ্দীকা বেগম সাহেবা (দুনিয়াপুর, পাকিস্তান)-এর মৃত্যু। তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৫ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ যেসব সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হবে তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো, হযরত খালেদ বিন কায়েস। হযরত খালেদ খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু বায়াযা-র সদস্য ছিলেন। তার পিতা ছিলেন কায়েস বিন মালেক। তার মাতার নাম ছিল সালামা বিনতে হারেসা। তার স্ত্রী ছিলেন উম্মে রাবী যার ঘরে তার এক পুত্র ছিলেন আব্দুর রহমান। ইবনে ইসহাক এর মতে তিনি সত্তর জন আনসার সাহাবীর সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন। হযরত খালেদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৯-৪৫০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত হারেস বিন খাযামা। তিনি আনসার ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু বিশর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। বনু আব্দিল আশআল-এর মিত্র ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল আবু বিশর। হযরত হারেস বিন খাযামা বদর, ওহুদ, খন্দক এবং অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত হরেস বিন খাযামা ও হযরত ইয়াস বিন বুকায়ের এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তবুক-এর যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) এর উটনী হারিয়ে গেলে মুনাফিকরা মহানবী (সা.) এর ওপর এই আপত্তি করে যে, তিনি নিজের উটনীর খবরই জানেন না তাহলে ঐশী সংবাদ কীভাবে জানতে পারেন? মহানবী (সা.) যখন এই বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি সেসব বিষয়ই জানি যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেন। এরপর তিনি আরো বলেন, এখন খোদা তা'লা আমাকে উটনী সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তা উপত্যকার অমুক ঘাটি বা স্থানে রয়েছে। এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে পূর্বেও এর কিছুটা উল্লেখ হয়েছে। যাহোক মহানবী (সা.) এর নির্দেশিত স্থান থেকে যে সাহাবী উটনী খুঁজে আনেন, তিনি ছিলেন হযরত হারেস বিন খাযামা। হযরত আলী-র খিলাফতকালে ৪০ হিজরী সনে ৬৭ বছর বয়সে মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬০২-৬০৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০৩ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা। তার ডাকনাম ছিল আবু হুযাফা। তার মাতার নাম ছিল যঈফা বিনতে হিযইয়াম। তিনি বনি সাহাম বিন আমর গোত্রের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুনায়েস হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা-র ভাই ছিলেন। হযরত খুনায়েস সেসব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা দ্বিতীয় বার হাবশা বা ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেন। হযরত খুনায়েসকে প্রাথমিক মুহাজেরদের মাঝে গণনা করা হয়। হযরত খুনায়েস যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত রিফা বিন আব্দিল মুনযের-এর কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত খুনায়েস এবং হযরত আবু আবস্ বিন জাবার এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত খুনায়েস বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা মহানবী (সা.) এর পূর্বে হযরত খুনায়েস-এর স্ত্রী ছিলেন। তাদের বিয়ে হয়েছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৯-৪৫০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০৩ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে এর বিবরণে লেখা হয়েছে যে,

"হযরত ওমর বিন খাত্তাব-এর একজন কন্যা ছিলেন, যার নাম ছিল হাফসা। তিনি খুনায়েস বিন হুযাফা-র স্ত্রী ছিলেন, যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন আর বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসার পর খুনায়েস অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি এই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি এবং কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। হযরত ওমর হযরত হাফসার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তখন হযরত হাফসার বয়স কুড়ির বেশি ছিল। হযরত ওমর নিজ প্রকৃতিগত সরলতায় নিজেই উসমান বিন আফফান এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, আমার কন্যা হাফসা বিধবা, আপনি চাইলে তাকে বিয়ে করে নিন। কিন্তু হযরত উসমান অস্বীকৃতি জানান। এরপর হযরত ওমর হযরত আবু বকরের কাছে বিয়ের কথা বলেন

যে, আপনি তাকে বিয়ে করে নিন। কিন্তু হযরত আবু বকরও নীরব থাকেন এবং কোন উত্তর দেন নি। এতে হযরত ওমর অনেক বিষণ্ন হন এবং দুঃখ পান। তিনি এই মনঃকষ্ট নিয়ে মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে এই পুরো বিষয়টি বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে ওমর! কোন চিন্তা করো না, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে হাফসা উসমান এবং আবু বকরের চেয়ে উত্তম স্বামী পাবে, আর উসমান হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী লাভ করবে। মহানবী (সা.) এই কথা এজন্য বলেছিলেন কেননা তিনি হাফসাকে বিয়ে করার এবং নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমানের সাথে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা সম্পর্কে হযরত আবু বকর এবং হযরত উসমান উভয়ে অবহিত ছিলেন, অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয়েছিল। আর এ কারণেই তারা হযরত ওমরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) হযরত উসমানের সাথে নিজের কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে দেন, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। আর এরপর তিনি (সা.) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে হযরত ওমরের কাছে হাফসার জন্য প্রস্তাব পাঠান। হযরত ওমর এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারতেন? তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন আর তৃতীয় হিজরী সনের শাবান মাসে হযরত হাফসা মহানবী (সা.) এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

এই বিয়ে যখন হয়ে যায় তখন হযরত আবু বকর হযরত ওমরকে বলেন, আমার কারণে হয়ত আপনি বিমর্ষচিত্ত হয়েছেন এবং মনঃকষ্ট পেয়েছেন। আসল কথা হলো, আমি মহানবী (সা.) এর ইচ্ছার কথা জানতাম, কিন্তু আমি তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। তবে হ্যাঁ, যদি তাঁর এই ইচ্ছা, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর এই বিয়ের ইচ্ছা না হতো, তাহলে আমি সানন্দে হাফসাকে বিয়ে করতাম।

হাফসার বিয়ের পেছনে একটি বিশেষ প্রজ্ঞা এটি ছিল যে, তিনি হযরত ওমরের কন্যা ছিলেন, যাকে হযরত আবু বকরের পর সকল সাহাবীর মাঝে সর্বোত্তম মনে করা হতো, আর মহানবী (সা.) এর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। অতএব পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করা এবং হযরত ওমর ও হাফসার এই মর্মযাতনা দূর করার জন্য, যা খুনায়েস বিন হুযাফা-র অকালমৃত্যুতে তাদের হয়েছিল, মহানবী (সা.) সমীচিন মনে করলেন যে, হাফসাকে তিনি নিজেই বিয়ে করবেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত, সীরাত খাতামাননাবীঈন পুস্তক, পৃ: ৪৭৭-৪৭৮)

এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা ওহুদের যুদ্ধে আহত হন। পরবর্তীতে সেই আঘাতের কারণেই মদীনায় তার ইন্তেকাল হয়। মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়িয়েছেন। আর তাকে হযরত উসমান বিন মাযঊনের পাশে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়েছে।

(ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫২) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ:৩০০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

পরবর্তী সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো- হযরত হারেসা বিন নোমান। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। হযরত হারেসা বিন নোমান আনসারী সাহাবী ছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সাথে। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি অতি মহান সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত হারেসার মায়ের নাম ছিল জাদা বিনতে উবায়েদ। তার সন্তানসন্ততির মাঝে আব্দুল্লাহ্, আব্দুর রহমান, সওদা, উমরা এবং উম্মে হিশাম অন্তর্ভু ক্ত। এই সন্তানদের মায়ের নাম ছিল উম্মে খালেদ। তার অন্যান্য সন্তানসন্ততির মাঝে রয়েছে উম্মে কুলসুম, যার মাতা বনু আব্দুল্লাহ্ বিন গাতফান এর সদস্যা ছিলেন। আর ছিলেন আমাতুল্লাহ্র মাতা জুনদার সদস্যা ছিলেন।

ইবনে আব্বাস বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হারেসা বিন নোমান মহানবী (সা.) এর পাশ দিয়ে যান। তখন তাঁর কাছে জিবরাঈল বসেছিলেন। আরেকটি সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়েতে ছিল যা আমি নিই নি। তাতে রয়েছে যে, তিনি পাশ দিয়ে হেঁটে যান এবং সালাম বলেন আর জিবরাঈল ওয়া আলাইকুম সালাম বলেছেন। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনা সংবলিত রেওয়ায়েত হলো- হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, হারেসা বিন নোমান মহানবী (সা.) এর পাশ দিয়ে যান আর তাঁর কাছে জিবরাঈল বসেছিলেন। তিনি (সা.) তার সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন। হারেসা তাদেরকে সালাম করেন নি। জিবরাঈল জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি সালাম করেন নি কেন? মহানবী(সা.) পরে হারেসাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি যখন যাচ্ছিলে, তখন সালাম কর নি কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি আপনার কাছে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, আপনি তার সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন। আমি আপনার কথার মাঝখানে কথা বলা পছন্দ করি নি, অর্থাৎ সালাম করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা পছন্দ করি নি। মহানবী (সা.)জিজ্ঞেস করেন, যে আমার কাছে বসেছিল তুমি কি তাকে দেখেছ? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.)বলেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল। আর জিবরাঈল বলেন, এই ব্যক্তি যদি সালাম করতো তাহলে আমি তাকে উত্তর দিতাম। এরপর জিবরাঈল বলেন, এ ব্যক্তি আশি জনের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.) বলেন, আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করি যে, এর অর্থ কি? তখন জিবরাঈল বলেন, তিনি সেই আশি জনের একজন যারা হুনায়েন-এর যুদ্ধে আপনার সাথে অবিচল ছিল। জান্নাতে তাদের এবং তাদের সন্তান-সন্ততির রিযক এর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লার হাতে। অতএব তিনি (সা.) হারেসার কাছে এসব কিছু বর্ণনা করেন।

হযরত আয়েশা বলেন, মহানবী (সা.) তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তার সম্পর্কে হযরত আয়েশারই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তিনি তার মায়ের সথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, এ ধরনের পুণ্যকর্ম তোমাদের সবারই করা উচিত।

হযরত হারেসা বিন নোমান শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তার নামাযের স্থান থেকে নিজ কামরার দরজা পর্যন্ত দীর্ঘ একটি রশি বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি নিজের কাছে একটি ঝুড়ি রাখতেন, যাতে খেজুর রাখা থাকতো। যখন কোন মিসকীন বা ভিক্ষুক আসতো বা কেউ সালাম করতো বা কোন সাক্ষাৎকারী আসতো, তাকে দরিদ্র মনে হলে সেই রশি ধরে তিনি নামাযের জায়গা থেকে দরজা পর্যন্ত আসতেন এবং তাকে খেজুর দিতেন। তার পরিবারের সদস্যরা বলতো যে, আমরা আপনার পক্ষ থেকে এই সেবামূলক কাজ সম্পাদন করছি, আমরা দান করছি। আপনি দেখতে পান না, আপনি কেন কষ্ট করবেন? কিন্তু তিনি বলতেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে শুনেছি যে, মিসকীনদের সাহায্য করা কষ্টদায়ক মৃত্যু থেকে মানুষকে রক্ষা করে। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত হারেসা-র কিছু ঘর মহানবী (সা.) এর ঘরের কাছে ছিল। তার অনেক ঘর ও সম্পত্তি ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী হযরত হারেসা তার নিজের ঘর মহানবী (সা.) এর জন্য ছেড়ে দিতেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৫৫-৬৫৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০৩ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

অর্থাৎ বিয়ে বা অন্য কোন প্রয়োজনে যখনই আবাসনের প্রয়োজন হতো, তিনি স্থায়ীভাবে তা ছেড়ে দিতেন।

হযরত ফাতেমার সাথে যখন হযরত আলীর বিয়ে হয়, তখন মহানবী (সা.) আলীকে বলেন যে, নিজের বসবাসের জন্য কোন পৃথক ঘর সন্ধান কর। হযরত আলী অস্থায়ী একটি ঘর খুঁজে বের করেন আর বিয়ে করে হযরত ফাতেমাকে সেখানে নিয়ে যান। এরপর মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমাকে বলেন যে, আমি তোমাকে আমার কাছে ডাকতে চাই অর্থাৎ আমার কাছে আস, নিকটেই কোন ঘর নাও। হযরত ফাতেমা তাঁকে পরামর্শ দেন অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, আপনি হারেসা বিন নোমানকে বলুন তিনি যেন অন্যত্র স্থানান্তরিত হন আর তার ঘর আমাদেরকে দিয়ে দেন। মহানবী (সা.) বলেন, হারেসা আমাদের জন্য বেশ কয়েকবার ঘর পরিবর্তন করেছে। তার ঘর আমার ঘরের সন্নিকটবর্তী। আমার নিকটবর্তী যে ঘরই থাকে, তিনি তা আমার জন্য ছেড়ে দেন। এখন তাকে আবার স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বলতে আমার লজ্জা হয়। এই সংবাদ হযরত হারেসার কর্ণগোচর হলে তিনি সেই ঘর খালি করে অন্যত্র স্থানান্তরিত হন। আর গিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি ফাতেমাকে আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চান। আমার ঘর আপনার চরণে উৎসর্গ করছি,আর বনু নাজ্জারের ঘরগুলোর মাঝে এটি আপনার সবচেয়ে কাছে। আমি এবং আমার সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্যই। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমার কাছ থেকে

ইমামের বাণী

প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার জামাতভুক্ত নহে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা: ৩৫)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

আপনার যে সম্পত্তি পছন্দ হয় তা গ্রহণ করুন। সেটি আমার কাছে সেই সম্পদের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হবে যেটি আপনি গ্রহণ করবেন না। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি আশিস বর্ষণ করুন। অতএব মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমাকে হযরত হারেসার গৃহে স্থানান্তরিত করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, তখন পর্যন্ত হযরত আলী মহানবী (সা.) এর সাথে মসজিদের কোন কক্ষে থাকতেন। কিন্তু বিয়ের পর কোন পৃথক ঘরের প্রয়োজন দেখা দেয় যাতে স্বামী স্ত্রী বসবাস করতে পারে। এ কারণে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বলেন যে, তুমি কোন ঘর খোঁজ কর যাতে তোমরা উভয়ে থাকতে পারবে। হযরত আলী সাময়িকভাবে একটি গৃহের ব্যবস্থা করেন। আর হযরত ফাতেমাকে সেই ঘরে নিয়ে যান। সেদিনই বিদায়ের পর মহানবী (সা.) সেই ঘরে যান আর একটু পানি আনিয়ে তাতে দোয়া করেন। এরপর সেই পানি এই দোয়া দিতে গিয়ে হযরত আলী এবং ফাতেমার ওপর ছিটিয়ে দেন যে, **আল্লাহুম্মা বারেক ফিহিমা ওয়া বারেক আলায়হিমা ওয়া বারেক লাহুমা নাসলাহুমা।** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাদের উভয়ের সম্পর্ককে আশিসমণ্ডিত কর আর তাদের সেই সম্পর্কে কল্যাণ রেখে দাও যা অন্যদের সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আশিসমণ্ডিত কর। অর্থাৎ তাদের উভয়ের সম্পর্কে, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের সাথে তাদের সম্পর্কে, তথা সবার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কল্যাণের দোয়া করেন। এছাড়া বলেন যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আশিসমণ্ডিত কর। এরপর তিনি সেই নবদম্পতিকে রেখে ফিরে আসেন। এরপর একদিন মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমার ঘরে যান। হযরত ফাতেমা মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হযরত হারেসা বিন নোমান আনসারীর কাছে কয়েকটি ঘর আছে। আপনি তাকে বলুন, কোন একটি ঘর খালি করে দিতে। তিনি (সা.) বলেন, তিনি আমাদের জন্য ইতিপূর্বে এত ঘর ছেড়েছেন যে, এখন তাকে বলতে আমার বাধে। হারেসা কোনভাবে তা জেনে যান, তিনি ছুটে আসেন আর মহানবী (সা.) কে বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যা কিছু আমার তা আপনারই। খোদার কসম, আপনি আমার কাছ থেকে যে জিনিসই গ্রহণ করেন, তা আমার কাছে রয়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমাকে বেশি আনন্দ দেয়। এরপর সেই নিষ্ঠাবান সাহাবী জোরপূর্বক নিজের একটি ঘর খালি করে হস্তান্তর করেন। অতঃপর হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা সেখানে এসে বসবাস করা আরম্ভ করেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন; পৃ: ৪৫৬)

হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন যে, তোমাদের মাঝে কে রাতের বেলা পাহারা দিবে? তখন হযরত হারেসা বিন নোমান ধীরে-সুস্থে দণ্ডায়মান হন। হযরত হারেসা নিজের কোন কাজে তাড়াহুড়ো করতেন না। সাহাবীরা তার এত ধীর পদচারণার কারণে মহানবী (সা.)-কে বলেন যে, লজ্জাবোধ হারেসাকে নষ্ট করে দিয়েছে, এই সময়ে তার দ্রুত উঠা উচিত ছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি বলো না, এটি বলো না যে, লজ্জাবোধ হযরত হারেসাকে নষ্ট করেছে বরং যদি তোমরা এটি বল যে, লজ্জাবোধ হযরত হারেসাকে ভালো মানুষে পরিণত করেছে তাহলে তা সত্য হবে।

(আল মুনতাকি মিন কিতাব মাকারিমুল আখলাক লিল খারায়েতি, পৃ: ৬৮, বাব ফযিলাতুল হায়া, হাদীস, ১২৭, প্রকাশনায় দারুল ফিকর, দামাস্ক, ১৯৮৮ সাল)

হযরত হারেসা বিন নোমান এর মৃত্যু হয়েছে হযরত আমির মুয়াবিয়ার যুগে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত বশীর বিন সাদ। তার ডাকনাম ছিল আবু নোমান। তার পিতা ছিলেন সাদ বিন সালেবা। তিনি হযরত সিমাক বিন সাদ-এর ভাই ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

(ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭২)

তার মায়ের নাম ছিল উনায়সা বিনতে খলীফা আর তার স্ত্রীর নাম হলো হামরা বিনতে রাওয়াহা। হযরত বশীর বিন সাদ অজ্ঞতার যুগেও লিখতে জানতেন। এটি সেই যুগ ছিল যখন আরবে খুব কম সংখ্যক মানুষই লিখতে জানতো। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে তিনি সত্তর জন্য সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ বাকী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরীর শাবান মাসে হযরত বশীর বিন সাদের তত্ত্বাবধানে ত্রিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দলকে যুদ্ধাভিযানে ফাদাক বিন মুররার প্রতি প্রেরণ করেন। তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। হযরত বশীর পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ করতে গিয়ে তার গোড়ালিতে তরবারি লাগে আর মনে করা হয় যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। চেতনা হারিয়ে হয়ত তিনি পড়ে গিয়ে থাকবেন। শত্রুরা ধরে নেয় যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তাই তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। সন্ধ্যায় তিনি চেতনা ফিরে পান। আর সেখান থেকে ফাদাক-এ চলে আসেন। ফাদাক-এ তিনি কয়েকদিন এক ইহুদীর ঘরে অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় ফিরে আসেন। অনুরূপভাবে সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তাকে তিনশত ব্যক্তির সাথে ইয়েমেন এবং জওয়ার এর দিকে প্রেরণ করেন, যেই জায়গা ফাদাক এবং কারান উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত। এখানে গাতফান গোত্রের কিছু লোক উয়ায়না বিন হিনস আলফারাদি-র সাথে একত্রিত হয়। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। তাদের মোকাবেলা করে হযরত বশীর তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেন। মুসলমানরা তাদের কতককে বন্দি করে আর কতককে হত্যা করে। আর গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২-৪০৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

এরা সমবেত হতো যুদ্ধ করার জন্য আর ক্ষতি করার জন্য। এই কারণে মুসলমানদের নিরাপত্তার খাতিরে এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হতো। ধনসম্পদ লুটপাট করা বা হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল না। যেভাবে আমি গত খুতবায় বলেছিলাম যে, অন্যায় হামলা বা অবৈধ হামলার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে, তোমরা কেন যুদ্ধ করেছ?

বশীর বিন সাদ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা তাঁর পুত্র হযরত বশীর বর্ণনা করেন যে, হযরত নোমান বিন বশীর বলেন, তার পিতা তাকে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসেন আর বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি আমার এ পুত্রকে আমার এক ক্রীতদাস উপহার দিয়েছি। তখন মহানবী বলেন তুমি কি তোমার সকল পুত্রকে একইভাবে (উপহার দিয়েছ)? তিনি উত্তরে বলেন, না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তা ফেরত নাও।

(সহী বুখারী, কিতাবুল হিবা, হাদীস, ২৫৮৬)

এক রওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত নোমান বিন বশীর বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু সম্পদ দান করেন। পূর্বেরটিও বুখারীর রেওয়ায়েত ছিল, আর এটিও। আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা বলেন, যতক্ষণ তুমি মহানবী (সা.)-কে সাক্ষী না করবে, আমি একমত হবো না। আমাকে প্রদত্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে সাক্ষী করার জন্য আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর কাছে যান। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানের সাথে সমান ব্যবহার করেছ, অর্থাৎ সবাইকে এতটা সম্পদ বা সম্পত্তি দিয়েছ? তিনি উত্তরে বলেন, না। তিনি বলেন, খোদাকে ভয় কর আর তোমার সন্তানদের সবার প্রতি সমান ব্যবহার কর। আমার পিতা ফিরে আসেন আর সেই দান ফেরত নেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল হিবা, হাদীস-২৫৮৭)

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী বলেছেন, আমাকে সাক্ষী করো না, কেননা আমি অন্যায়ের সাক্ষী হই না।

(সহী মুসলিম, কিবাতুল হিবাত, হাদীস ৪১৮২)

এই বিষয় বা এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বা হেবার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা অতি উত্তম পথ নির্দেশনা। তিনি বলেন, আমি মনে করি মহানবী (সা.)-এর এ কথা মূল্যবান জিনিসপত্র সম্পর্কে, ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়। উদাহরণস্বরূপ কলা খাওয়ার সময় সামনে উপস্থিত শিশুকে যদি আমরা কলা দিই আর দ্বিতীয় শিশু বঞ্চিত থাকে (তাহলে সে ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়)। হাদীসে ঘোড়া বা সম্পদের বা ক্রীতদাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে অর্থাৎ কোন মূল্যবান বস্তুর কথা বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে বলেন তার হয় সকল পুত্রকে একটি করে ঘোড়া দেওয়া উচিত অথবা কাউকেই দেওয়া উচিত নয়। এর কারণ ছিল আরবদের মাঝে ঘোড়ার মূল্য অনেক বেশি ছিল বা ক্রীতদাসকেও সম্পত্তি গণ্য করা হতো, অথবা সম্পদ অর্থাৎ যে কোন প্রকার মূল্যবান জিনিস বোঝানো হয়েছে। অতএব মূল্যবান কোন জিনিস দিতে

বারণ করা হয়েছে। আর ঘোড়া আরবদের মাঝে অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল। অতএব এ নির্দেশ সেসব বস্তু সম্পর্কে যে ক্ষেত্রে পরস্পরেরমাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক সন্তানকে দিলে আর অন্য জনকে না দিলে একের হৃদয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। তিনি বলেন এ নির্দেশ গুলো ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর কোন ছেলে যদি আমাদের সাথে বাজারে যায়, আর আমরা তাকে দোকান থেকে কোটের কাপড় ক্রয় করে দিই, তাহলে এই কাজ সম্পূর্ণভাবে বৈধ হবে। এটি বলা যাবে না যে, যতক্ষণ আমরা সবার জন্য কোট কিনে না আনব কোন একটি ছেলেকে কোটের কাপড় কিনে দেওয়া যাবে না। তিনি লিখেন, আমাদের ঘরে কোন কোন সময় উপহার আসে, তখন যে শিশু সামনে থাকে, সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দেওয়া হোক, আর আমরা সেই উপহার তাকে প্রদান করি। এর অর্থ এটি নয় যে, আমরা অন্যদের বঞ্চিত রাখি। বরং আমরা মনে করি অন্য কোন উপহার আসলে অন্য জনকে দেওয়ার পালা এসে যাবে। অতএব এ নির্দেশ ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়, বরং বড় বা মূল্যবান জিনিস সম্পর্কে, যে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করলে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি বলেন, আমার রীতি হলো, আমার কোন সন্তান যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন আমি তাকে কিছুটা জমি দিয়ে দিই, যেন সে তা থেকে ওসীয়্যত করতে পারে। অর্থাৎ সম্পত্তির মালিক হলে ওসীয়্যত করতে পারবে আর চাঁদা দিতে পারবে। এখন এর অর্থ এটি নয় যে, আমি অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখি। বরং আমি বলি যে, অন্যরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন তারাও তাদের অংশ পেয়ে যাবে। কিন্তু সেই সম্পত্তি এমন হওয়া উচিত যা বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন হেবা করে যার ফলে অন্যদের হৃদয়ে বিদ্বেষ দানা বাধার আশঙ্কা থাকে তাহলে কুরআনের নির্দেশ হলো সে যেন তা ফেরত নেয় আর তাকে সেই পাপ থেকে রক্ষা করা আত্মীয়স্বজনের কর্তব্য।

(আল ফযল, ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০, পৃ: ৫)

আরেকবার এ ধরনের হেবা সংক্রান্ত একটি বিষয় সামনে আনা হয়। মুফতি সাহেব তা উপস্থাপন করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এর জন্য পবিত্র কুরআনে সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - তা আমাদের দেখতে হবে। কুরআন শরীফ এমন হেবার কথা উল্লেখ করে নি বরং উত্তরাধিকারের কথা বলেছে, যাতে সকল উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় মানুষ নিজেদের সম্পত্তি বণ্টন করে আর এই বিষয়গুলো সামনে রাখে না, যার ফলে মামলা-মোকদ্দমা চলতে থাকে আর মনোমালিন্য দেখা দেয়।

তিনি বলেন, কুরআনের নির্ধারিত অংশগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এখন এটি দেখতে হবে যে, এসব নির্দেশ দেওয়ার পেছনে কি প্রজ্ঞা রয়েছে। উত্তরাধিকার আইন অনুসারে কেন সব ছেলের সমান অধিকার পাওয়া উচিত। আর এক ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে কেন মহানবী (সা.) তার পিতাকে বলেছেন, হয় তাকেও ঘোড়া ক্রয় করে দাও অন্যথায় অন্যদের কাছ থেকেও ঘোড়া ফেরত নাও। এতে নিহিত প্রজ্ঞা হলো, যেভাবে সন্তানের জন্য পিতামাতার আনুগত্য করা আবশ্যক, একইভাবে পিতামাতার জন্যও সন্তানদের সাথে সমান ব্যবহার এবং সমানভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন আবশ্যক। কিন্তু পিতামাতা যদি অন্যথা করে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করে, অর্থাৎ যদি একদিকে ঝুঁকে যায়, তাহলে সন্তান হয়ত নিজের পালনীয় দায়িত্বকে অবজ্ঞা করবে না, অর্থাৎ সন্তান হয়ত পিতামাতার প্রাপ্য দিতে থাকবে, কিন্তু দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ পিতামাতার সেবায় কোন খুশি ও আনন্দ পাবে না, বরং এটিকে বোঝা মনে করে পালন করবে। আল্লাহ্ তা'লা সেবা করতে বলেছেন, তাই বাধ্য হয়ে করছি। কিন্তু সানন্দে করবে না।

তিনি লিখেন, কিছু মানুষের এমন ব্যবহার সন্তানের জন্য ক্ষতিকর এবং প্রীতি ও ভালোবাসার জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে, যা সন্তানসন্ততি ও পিতামাতার মাঝে হয়ে থাকে। এ কারণে ইসলাম এটি থেকে বারণ করেছে। কিন্তু যে ওসীয়্যত ও হেবা সন্তানের জন্য হয় না, বরং ধর্মের জন্য হয়ে থাকে তা বৈধ। সন্তানসন্ততি বা বৈধ উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে মানুষ এরূপ হেবা বা ওসীয়্যত করতে পারে কেননা সে নিজেও সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। শুধু সন্তানসন্ততিরই ক্ষতি হয় না, বরং সে ব্যক্তি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ হয় তাই সন্তানসন্ততিও মর্মাহত হয় না বা কষ্ট পায় না। কিন্তু যদি হেবা বা ওসীয়্যত কোন বিশেষ সন্তানের অনুকূলে করা হয় তাহলে তা অবৈধ। এতে একটি বোঝার বিষয় রয়েছে যে, একটি দায়িত্ব হয়ে থাকে সাময়িক, যা পালন করা আবশ্যক হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝে নিন যে, ধরুন এক ব্যক্তির চার ছেলে রয়েছে। সে সবচেয়ে বড় ছেলেকে এম.এ পর্যন্ত পড়িয়েছে। আর অন্যরা প্রাথমিক শ্রেণি সমূহে লেখাপড়া করার সময়ই তার চাকরি চলে যায় বা উপার্জন কমে যায়, যার ফলে ছোট সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এখন এই আপত্তি করা যাবে না যে, সে বড় ছেলের অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব করেছে, বরং এটি তো একটি দৈব বিষয়। অর্থাৎ তার চেষ্টা ছিল, প্রথমে বড় ছেলেকে লেখাপড়া করাব, এরপর অন্যদেরকে পালাক্রমে এমএ পর্যন্ত পড়াব বা যে পর্যন্ত তারা পড়তে পারে পড়াব। অর্থাৎ সাময়িক প্রয়োজনের নিরিখে সে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। সদিচ্ছায় ঘাটতি ছিল না। অর্থাৎ এখন এই কাজটি করে নেই, যখন দ্বিতীয় জনের পালা আসবে তখন তা-ও করে নিব, কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায়। আর সে নিজের বাসনা পূর্ণ করতে পারে নি। এর বিপরীতে যদি কোন পিতা নিজের বড় ছেলেকে, যার নিজেরও পরিবার এবং সন্তান-সন্ততি রয়েছে, দুই হাজার রুপি দিয়ে এই বলে পৃথক করে দেয় যে, তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য কর। কিন্তু যখন অন্য ছেলেদের ঘরে সন্তানসন্ততি হয় তখন তাদেরকে যদি কিছুই না দেয় তাহলে এটি অবৈধ এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার হবে। যাহোক এই ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পত্তির সাথে সম্পর্ক রাখে, যা সম্পত্তির বণ্টন বা হেবা করার সময় বা ওসীয়্যত করার সময় সবার সামনে রাখা উচিত।

(হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি, সৌজন্যে: সৈয়্যদ শামসুল হক সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা, পৃ: ৩১৬-৩১৭)

বশীর বিন সাদ, অর্থাৎ যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তার মেয়ে বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা আমার কাপড়ে কিছু খেজুর দিয়ে বলেন, হে আমার কন্যা! এগুলো তোমার পিতা এবং মামাকে দিয়ে আস, আর বলো যে, এ হলো তোমাদের সকালের নাশতা। তার মেয়ে বলেন, আমি খেজুরগুলো নিয়ে নিজের পিতা এবং মামার সন্ধানে বের হই এবং মহানবী (সা.) এর পাশ দিয়ে যাই। মহানবী (সা.) বলেন, হে বালিকা! তোমার কাছে এগুলো কী? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এগুলো খেজুর, যা আমার মা আমার পিতা বশীর বিন সাদ আর মামা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা-র জন্য পাঠিয়েছে। মহানবী (সা.)বলেন, এখানে নিয়ে আস, আমার কাছে দাও। আমি সেই খেজুরগুলো তাঁর (সা.) উভয় হাতে রেখে দিই। মহানবী (সা.) সেই খেজুরগুলো একটি কাপড়ে রাখেন এবং সেগুলোকে অন্য একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে দেন। আর এক ব্যক্তিকে বলেন যে, মানুষকে খাবারের জন্য ডাক। (তার ডাকে) সকল পরিখা খননকারী সমবেত হয় আর খেজুর খাওয়া আরম্ভ করে। আর সেই খেজুরগুলো (পরিমাণে) বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি পরিখাখননকারীরা খাওয়া শেষ করার পরও তাতে এত বরকত হয় যে, কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে খেজুর উপচে পড়ছিল।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৫৪-৪৫৫, দার ইবনে হাযাম কর্তৃক বেরুত থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খিলাফতকালে হযরত বশীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এর সাথে ১২ হিজরীতে আয়নুত তামার এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(আসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯৫ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

আয়নুত তামার কুফার নিকটবর্তী একটি জায়গা যা মুসলমানরা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ১২ হিজরীতে জয় করে।

(মুজামিল বালদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

সপ্তম হিজরীর যিল কাদা মাসে মহানবী (সা.)যখন ওমরায়ে কাযা-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি অস্ত্রশস্ত্র আগেই পাঠিয়ে দেন আর বশীর বিন সাদকে সেগুলোর নিগরান নিযুক্ত করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

ওমরায়ে কাযা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা হলো হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে তখন ওমরা করা সম্ভব হয় নি। সন্ধির দফাগুলোর একটি ছিল মহানবী (সা.) পরবর্তী বছর মক্কায় এসে ওমরা করবেন আর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, বাব উমরায়ে কাযা, হাদীস-৪২৫২)

এই দফা অনুসারে সপ্তম হিজরীর যুল-কাদা মাসে তিনি (সা.) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সংকল্প করেন। আর ঘোষণা করেন যে, যারা গত বছর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল তারা সকলেই আমার সাথে যাবে। অতএব যারা খায়বারের যুদ্ধে বা স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছে তারা ব্যতীত বাকি সকলেই এই সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো

ওমরা করার জন্য অস্ত্রের কী প্রয়োজন ছিল। (কেননা) তিনি (সা.) অস্ত্র আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা হলো, মক্কাবাসীদের ওপর যেহেতু মহানবী (সা.) এর আস্থা ছিল না যে, তারা অঙ্গীকার রক্ষা করবে, তাই তিনি (সা.) যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি সহকারে যান, অর্থাৎ যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে যান। আর যাত্রার সময় মহানবী (সা.) এক সাহাবী হযরত আবু যর গাফফারীকে মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন। আর দুই হাজার মুসলমানের সাথে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যাদের মাঝে একশত অশ্বারোহী ছিল। কুরবানীর জন্য সাথে ছিল ষাটটি উট। মক্কার অবিশ্বাসীরা যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম নিয়ে মক্কায় আসছেন, তখন তারা যারপরনায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য তারা কয়েক ব্যক্তিকে মাররুয যাহরান পর্যন্ত প্রেরণ করে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা, যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন, তার সাথে কুরাইশ দূতরা সাক্ষাৎ করে। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, মহানবী (সা.) সন্ধির শর্তানুসারে নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করবেন। এটি শুনে কাফেররা আশ্বস্ত হয়। মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে আট মাইল দূরবর্তী ইয়াজেয নামক স্থানে পৌঁছেন,তখন সব অস্ত্রশস্ত্র সেখানেই রেখে দেন এবং বশীর বিন সাদের নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবীকে সেসব অস্ত্রের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। নিজের কাছে একটি তরবারি ছাড়া তিনি আর কিছুই রাখেন নি। এরপর সাহাবীদের জামাতকে সাথে নিয়ে লাব্বাইক পড়তে পড়তে তিনি (সা.) হারাম শরীফে প্রবেশ করেন। বলা হয়, মহানবী (সা.) যখন কাবা শরীফের হারামে প্রবেশ করেন তখন অন্তর্দাহের কারণে কিছু কাফেরের জন্য এই দৃশ্য দেখা ছিল অসহনীয়, তাই তারা পাহাড়ে চলে যায়। অর্থাৎ মুসলমানরা এভাবে তওয়াফ করবে এটি আমাদের জন্য অসহনীয়। কিন্তু কিছু কাফের তাদের পরামর্শসভা দারুন-নাদওয়ায় সমবেত হয় আর সেখানে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত নয়নে একত্ববাদ ও রিসালতের নেশায় বিভোর লোকদের অর্থাৎ মুসলমানদের তওয়াফের দৃশ্য দেখতে থাকে। তারা পরস্পর বলছিল যে, এই মুসলমানরা আর কিইবা তওয়াফ করবে, এদেরকে তো ক্ষুধা এবং মদীনার জ্বর পিষ্ট করে রেখেছে। অর্থাৎ এরা দৈহিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। মহানবী (সা.)মসজিদে হারামে পৌঁছে ইসতিওয়া করেন অর্থাৎ এমনভাবে চাদরাবৃত হন যে, তারা ডান কাঁধ এবং বাহু খোলা ছিল। আর তিনি (সা.) বলেন, খোদা তার প্রতি কৃপা করুন যে এই কাফেরদের সামনে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ কাফেররা যেসব কথা বলছিল তা তাঁর (সা.) কর্ণগোচর হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, শক্তি প্রদর্শন কর, আর তা এভাবে যে, তোমাদের দেহ যেন দুর্বল প্রতিভাত না হয়, বরং যেন দৃঢ় প্রতিভাত হয়, আর কাঁধ যেন প্রশস্ত দেখা যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে প্রথম তিন তওয়াফে কাঁধ দুলিয়ে গর্বের সাথে হাঁটতে হাঁটতে তওয়াফ করেন। আরবী ভাষায় এটিকে বলা হয় রমল। এই রীতি আজও বলবৎ রয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ কাবা শরীফের প্রত্যেক তওয়াফকারী কাবা শরীফের প্রথম তিন তওয়াফে রমল করে। এভাবে চলার এটিই কারণ।

(শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড , পৃ: ৩১৪-৩১৭, ৩২১-৩২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯৬ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৯, বাব উমরায়ে কাযা, (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৩, নুমানি কুতুব খানা কর্তৃক দ্বারা লাহোর থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল-২০০৫)

মহানবী(সা.) কতবার ওমরা করেছেন- এ সম্পর্কে বুখারীতে যেহাদীস রয়েছে তাতে বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করি যে, মহানবী (সা.) কতবার ওমরা করেছেন? তিনি বলেন, চার বার। হুদায়বিয়ার ওমরা যা তিনি যুল-কাদা মাসে করেছেন। সেই ওমরা যদিও সম্পন্ন হয় নি কিন্তু এটিকে ওমরা গণনা করা হয় কেননা সেখানে কুরবানী ইত্যাদি করা হয়েছে আর মাথাও কামানো হয়েছে। এই কারণে কেউ কেউ এটিকে ওমরা হিসেবে গন্য করেছেন। মুশরিকরা যখন তাকে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে বাঁধা দিয়েছিল এটি হলো সেই প্রথম ওমরা। এরপর রয়েছে সেই ওমরা যা দ্বিতীয় বছর হয়েছে। প্রথম ওমরা তো হুদায়বিয়ার সময় করা সম্ভব হয়নি। শুধু কুরবানী ইত্যাদি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ওমরা হয়েছে পরবর্তী বছর যুল-কাদা মাসে। পরবর্তীটি হলো জিরানার ওমরা, যখন তিনি গনিমতের মাল বিতরণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় এগুলো হুনায়েন এর যুদ্ধের গনিমতের মাল ছিল। তখনও তিনি (সা.) ওমরা করেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম অর্থাৎ বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি (সা.) কতবার হজ্ব করেছিলেন। তিনি বলেন, একবারই হজ্ব করেছেন। আর হজ্বের সময়ওওমরা আদায় করেছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ বলে চারবার আর কেউ বলে দুবার ওমরা করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল উমরা, হাদীস-১৭৭৮-১৭৭৯)

হযরত বশীর বিন সাদ প্রথম আনসার ছিলেন যিনি হযরত আবু বকরের হাতে সকিফা বনু সায়েদার দিন বয়আত করেছিলেন।

(ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩)

সকিফা বনু সায়েদা কী? এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, এটি মদীনায় বনু খাযরাজের বসার জায়গা ছিল।

(আল মুজামিল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৯ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ১৯৯০ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

সে যুগের নিরিখে এটি একটি কামরা ছিল বা ছাদঢাকা একটি জায়গা ছিল। মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর এখানে সকিফা বনু সায়েদায় তাঁর (সা.) স্থলাভিষিক্ত কে হবে- এ প্রসঙ্গে বনু খাযরাজ এর একটি সভা হচ্ছিল। এ সভার সংবাদ হযরত ওমরকে দেওয়া হয় আর একইসাথে বলা হয় যে, কোথাও মুনাফিক এবং আনসারদের কারণে কোন নৈরাজ্য না ছড়িয়ে পড়ে! তখন হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে হযরত ওমর ফারুক সকিফা বনু সায়েদায় পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে জানা যায় যে, বনু খাযরাজ খিলাফতের দাবিদার আর বনু অউস এর বিরোধিতা করছে। এদের উভয়টি ছিল মদীনার আনসার গোত্র। এমন সময় একজন আনসার সাহাবী মহানবী (সা.) এর একটি উক্তি স্মরণ করান যে, শাসক কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে, যা সেই বিতর্ক চলাকালে বেশিরভাগ মানুষের হৃদয়ে ঘর করে নেয়। আনসাররা তাদের দাবি প্রত্যাহার করে। আর সবাই তাৎক্ষণিকভাবে আবু বকরের হাতে বয়আত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দীক তিন দিন পর্যন্ত এই ঘোষণা করা অব্যাহত রাখেন যে, আপনারা সকীফা বনু সায়েদায় কৃত বয়আতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বলতে পারে। কিন্তু কেউ কোন আপত্তি করে নি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত উদ্বৃতি যা ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র পুস্তক থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৬৮, ২০০৯ সনে দার ইবনে হাযাম কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত) (ডক্টর মহম্মদ হামীদুল্লাহ্ রচিত 'মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) কি হুকমুরানী ও জানেশীনী পৃ: ১৫৫-১৫৬, মাকতুবাতুর রহমানিয়া কৃর্তৃক লাহোর থেকে প্রকাশিত)

কিন্তু এর আরো একটি বিস্তারিত বিবরণ হলো, যখন সকিফা বনু সায়েদার ঘটনা ঘটে, তাদের মাঝে যে বৈঠক হচ্ছিল, মুনাফেকরা আনসারদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল, তখন হযরত ওমরের সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক সেখানে পৌঁছেন, তার সেখানে পৌছার পর আনসাররা পুনরায় তাদের মতামত ব্যক্ত করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীকও নিজের মতামত প্রকাশ করেন। এই পুরো কার্যক্রম থেকে বুঝা যায় যে, আনসার ও মুহাজের সবাই ইসলামের স্বার্থেই চিন্তা করছিল। মুনাফেকরা তো নৈরাজ্য সৃষ্টির কথাই ভাবছিল। কিন্তু আনসার মু'মিনরা এই শুভচিন্তাই করছিল যে, খিলাফত এবং ইমামত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, তা আনসারদের মধ্য থেকেই হোক বা মুহাজেরদের মধ্য থেকেই হোক। আর মহানবী (সা.) এর তিরোধানের পর তারা চাইতেন যেন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাদের পরম বাসনা ছিল। আর তারা একদিনও জামাত এবং আমীর ছাড়া অতিবাহিত করা পছন্দ করতেন না। যেমন- একটি রায় ছিল আনসারদের মধ্য থেকে আমীর হোক, আর দ্বিতীয় রায় ছিল মুহাজেরদের মধ্য থেকে আমীর নিযুক্ত হোক, কেননা আরবরা তাদের ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব

আল্লাহ্‌র বাণী

"নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিন পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী (মুযাম্মিল:৭)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

আল্লাহ্‌র বাণী

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করিয়া তাঁহারই প্রতি পূর্ণ অনুরক্তির সহিত অনুরক্ত হও। (মুযাম্মিল:৯)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

গ্রহণ করবে না। এ ছাড়া আরেকটি তৃতীয় মতামত ছিল দুজন আমীর হোক। অর্থাৎ একজন আনসারদের মধ্য থেকে আর একজন মুহাজেরদের মধ্য থেকে। এ পর্যায়ে মুহাজেররা আনসারদের এটিও বলে যে, এখন কুরাইশদের মধ্য থেকেই আমীর নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তারা তাদের অবস্থানের পক্ষে মহানবী (সা.) এর পর কুরাইশদের মাঝে ইমামত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করে, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আল আয়েম্মাতু মিন কুরায়েশ'। অর্থাৎ নেতা কুরায়েশদের মধ্য থেকে হবে।

(আস সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৪-৫০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০২ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত))

হযরত আবু উবাইদাহ বিন জারাহ আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেন, হে মদিনার আনসারগণ! তোমরা হলে সেসব লোক, যারা এ ধর্মের সেবার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখন তোমরা এর সর্বপ্রথম পরিবর্তনকারী বা বিকৃতকারী হয়ো না, আরএ কথা বলো না যে, আমীর আনসারদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত বা উভয় পক্ষ থেকে হওয়া উচিত। আনসাররা এই বস্তুনিষ্ঠ বাণীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়, আর তাদের মধ্য থেকে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি অর্থাৎ হযরত বশীর বিন সাদ দণ্ডায়মান হন এবং আনসারদের সম্বোধন করে বলেন, হে আনসাররা! খোদার কসম, যদিও মুশরিকদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় জিহাদের ক্ষেত্রে মুহাজেরদের ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, কিন্তু আমরা এটি করেছি শুধু খোদার সন্তুষ্টি, রসূলের আনুগত্য এবং আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে। তাই এখন অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘায় মত্ত হওয়া আরধর্মসেবার বিনিময়ে এমন প্রতিদান প্রত্যাশা করাআমাদের শোভা পায় না যা থেকে জাগতিকতার দুর্গন্ধ আসে। আমাদের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে রয়েছে আর তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা.) কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তারাই খিলাফতের অধিকার রাখে। এমনটি যেন না হয় যে, আমরা তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হব। হে আনসারগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর মুহাজেরদের সাথে মতভেদ করো না। এসব কথা বলার পর পুনরায় হযরত হুব্বাব বিন মুনযের আনসারদের গুরুত্ব বর্ণনা করা আরম্ভ করেন। কিন্তু হযরত ওমর পুনরায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন, আমি সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি বর্ণনা করছি, আর হযরত আবু বকরের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন যে, আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন এবংএকইসাথে হযরত আবু বকরের হাতে বয়আত করেন আর বলেন যে, হে আবু বকর! আপনাকে মহানবী (সা.)নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই আপনিই আল্লাহ্‌র খলীফা। আপনি আমাদের সবার চেয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন, তাই আমরা সবাই আপনার হাতে বয়আত করছি। হযরত ওমরের পর হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ বয়আত করেন। এরপর আনসারদের মধ্য থেকে হযরত বশীর বিন সাদ তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেন। এরপর হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী বয়আত করেন, আর হযরত আবু বকরের হাত ধরে আনসারদের সম্বোধন করেন আর তাদেরকেও হযরত আবু বকরের হাতে বয়আতের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অতএব আনসাররাও হযরত আবু বকরের হাতে বয়আত করে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০৬ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত) (আস সীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ:৫০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা ২০০২ সালে বেরুত থেকে প্রকাশিত)

ইসলামী সাহিত্যে এটি বয়আতে সকীফা এবং বয়আতে খাসা নামে প্রসিদ্ধ।

(তারিখুল খুলাফায়ে রাশেদীন, প্রণেতা- মহম্মদ সোহেল তাকুশ, পৃ: ২২)

হযরত আবু মাসঊদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, একবার আমরা হযরত সাদ বিন উবাদার বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন। হযরত বশীর বিন সাদ তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো আমরা কীভাবে দরূদ প্রেরণ করব। বর্ণনাকারী বলেন যে, এই প্রশ্ন শুনে মহানবী (সা.) দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। আমাদের মনে হলো, সে প্রশ্ন না করলেই ভালো হতো। কিন্তু এরপর মহানবী (সা.)বলেন, তোমরা বলো **'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহিমা ফিল আলামিন ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।'** আর সালাম কিভাবে করতে হয় তা তোমরা জান।

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত, হাদীস- ৯০৭)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

আজকের সাহাবীদের স্মৃতিচারণ এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। একটি দোয়ার ঘোষণা করতে চাই। সম্প্রতি বাংলাদেশে জলসার প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা চলছিল। জলসা নতুন জায়গায় হওয়ার কথা ছিল, তাদের এক শহর আহমদনগরে। নামধারী আলেম এবং বিরোধীরা অনেক হৈচৈ করেছে। প্রথমে তারা সরকারের কাছে জলসা বন্ধ করার দাবি উত্থাপন করে। আর সরকার দাবি না মানলে, দাঙ্গাবাজরা আহমদীদের বাড়িঘর এবং দোকানপাটে হামলা করে। কিছু ঘরে অগ্নিসংযোগ করে আর কিছু দোকান জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে। কিছু আহমদী আহতও হয়েছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন সেখানকার পরিস্থিতিতে অনুকূল পরিবর্তন আনেন। আহতদের আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত ও পূর্ণ আরোগ্য দান করুন, তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন,আর ভবিষ্যতে যখনই জলসার তারিখ নির্ধারিত হয় তারা যেন নিরাপদে জলসা করতে পারে।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি শ্রদ্ধেয়া সিদ্দীকা বেগম সাহেবার যিনি পাকিস্তানের দুনিয়াপুরের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার মুবাল্লেগ ইনচার্য লাঈক আহমদ মুশতাক সাহেবের মা আর শেখ মুযাফফর আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ১লা ফেব্রুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।

তার বংশে আহমদীয়াতের আগমন হয় তার দাদা মোহতরম শেখ মুহাম্মদ সুলতান সাহেবের মাধ্যমে। যিনি ১৮৯৭ সনে ২৪ বছর বয়সে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমার বিয়ে হয় ৬৪ সনের ২৯ আগস্ট তারিখে। পুরো জীবন তিনি এক দৃষ্টান্তমূলক স্ত্রীর মতো অতিবাহিত করেছেন। স্বল্প উপার্জনের মাঝে সাদামাটা জীবনযাপন করে কেবল নিজের বড় পরিবারেরই লালন পালন করেন নি বরং নিজের দেওর এবং ননদদের বিয়েও দিয়েছেন। সর্বদা নিজের সাচ্ছন্দের ওপর অপরের সাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দিতেন। নামায-রোযায় অভ্যস্ত, দোয়াগো, বিনয়ী, মিশুক, সরল, দরিদ্র সেবিকা, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বহু আহমদী ও অআহমদী শিশুদের পবিত্র কুরআন নাযেরা পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নিজ খরচে হাফেয ডেকে নিজের এক কন্যা এবং দুই পুত্রকে কুরআন শরীফ হিফয করিয়েছেন। কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল তার।

দুনিয়াপুর জামাতে লাজনার প্রেসিডেন্ট ছাড়াও সেক্রেটারী মাল এবং ইশায়াত হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল । মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তিনি তার পরিবারে স্বামী, দুই কন্যা এবং পাঁচ পুত্র রেখে গেছেন। তার দুই পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী, যাদের মাঝে একজন হলেন, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, লাঈক আহমদ মুশতাক সাহেব, যিনি দক্ষিণ আমেরিকায় সুরিনামে মুবাল্লেগ ইনচার্য হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি পাকিস্তানে যেতে পারেন নি। তার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ ওলীদ আহমদও জামাতের মুরব্বী। তিনিও পাকিস্তানে আছেন এবং সেখানে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার এক জামাতা মুযাফফর আহমদ খালেদ সাহেবও জামাতের মুরব্বী, যিনি পাকিস্তানে রাবওয়ায় কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ বিভাগে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে মাগফিরাত ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদের তার পুণ্যকে জারী রাখার তৌফিক দিন, তাদের পক্ষে তার দোয়া সমূহ কবুল করুন।

****

ইমামের বাণী

মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদাতালার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সে জাহেল, যে তাঁহার মোকাবেলায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, এমন নহে বরং এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। ***(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৯)***

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

ইমামের বাণী

যে ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়াত গ্রহণ করিয়া সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হইয়া স্বীয় কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করিবে। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৯)**

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

জুমআর খুতবা

" মিয়া মাহমুদের মাঝে এতটা ধর্মীয় উদ্দীপনা ও উচ্ছাস বিদ্যমান যে, আমি অনেক সময় তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করি। "

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

"হে আমার প্রভু! তুমি আমার চোখের সামনে ইসলামকে জীবিত করে দেখাও।"

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)]

"তাঁর বক্তব্য, ভাষণ, রচনাবলী এবং কুরআনের তফসীর একথার সাক্ষ্য যে তাঁকে খোদা তালা স্বয়ং পড়িয়েছেন।"

"তার কথা প্রভাব বিস্তার ও আবেদন সৃষ্টি আর নিষ্ঠা ও আত্মবিলীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। কৃত্রিমতা কাকে বলে তা তার উক্তি জানতো না। আর লেখা ছিল ভণিতামুক্ত। বক্তৃতায় এক সহজাত সাবলীলতা ছিল এবং রচনা ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন স্রোতস্বিনীর মতো। উভয়টি কুরআনের জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের পানিতে সমৃদ্ধ ছিল আর অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করত।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর)

এত ছোট বয়সে চিন্তাধারার এমন পরিপক্কতা নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। আমার মতে এটিও হুযূর (আ.) এর সত্যতারই একটি নিদর্শন। *(হযরত কাযী মহম্মদ জহুরুদ্দীন আকমল)*

যদি এই কথা বলা সঠিক হয় যে, মানুষের রূহ অন্যের ওপর অবতরণ করে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আত্মা তার ওপর নাযেল হচ্ছিল। আর এই ঘোষণা দিচ্ছিল যে, এই হলো আমার প্রিয় পুত্র, যাকে রহমতের নিদর্শন স্বরূপ দান করা হয়েছে। আর যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সে সৌন্দর্য ও পুণ্যকর্মে তোমার নযীর বা দৃষ্টান্ত হবে।

(হযরত মৌলবী শের আলি সাহেব)

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে শৈশব থেকেই দেখে আসছি যে, লজ্জাবোধের অভ্যাস, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা ও ধর্মের দিকে তার মনোযোগ আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ধর্মীয় কাজে শৈশব থেকেই তার আগ্রহ কেমন ছিল।

(হযরত মুফতি মহম্মদ সাদেক)

হে আমার খোদা! আমার জাতিকে সকল পরীক্ষা ও দুঃখ বেদনা থেকে রক্ষা কর এবং সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখ। তাদের মাঝে বড় বড় পুণ্যবান মানুষ সৃষ্টি কর। তারা এমন এক জাতিসত্তায় পরিণত হোক যারা তোমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে। আর তারা এমন এক জামা'তে পরিণত হোক যাদেরকে তুমি নিজের জন্য বিশেষভাবে বেছে নিবে। (আমীন)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আত্মার প্রতি সহস্র সহস্র রহমত বর্ষণ করুন। তিনি মহানবী (সা.) এর ধর্মের প্রসার এবং তাঁর নিষ্ঠাবান দাস মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য রাতদিন কাজ করে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেছেন।
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক অসাধারণ নিদর্শন, এক মহান পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আলোচনা।
এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন-স্থল হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর জীবনী থেকে কতিপয় চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর উল্লেখ।
হৃদয়কে পরিতৃপ্তকারী হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর একটি দোয়ার বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২২ফেব্রুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২২ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকাল জামাতে মুসলেহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে জলসা হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে, যাতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তিনি এই পুত্রকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক করবেন। তিনি ধর্মের সেবক হবেন, দীর্ঘজীবন লাভ করবেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এটি ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারির ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি ঐশী সমর্থন এবং তাঁর সত্যতার অনেক বড় একটি নিদর্শন। অতএব এই সন্তানের জন্মের যে সময়কাল দেওয়া হয়েছিল, সে অনুসারে এ সন্তান ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করে,যার নাম রাখা হয়েছে মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ। তাকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের ইন্তেকালের পর খিলাফতের পোশাক পরিধান করান।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর জীবনের কিছু ঘটনা এবং তিনিই যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল- এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব। কিন্তু তার পূর্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা তাঁরই ভাষায় উপস্থাপন করছি। এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল এক পুত্রের জন্ম সম্পর্কে নয়, বরং এমন এক মহান পুত্রের জন্ম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যার আগমনের মাধ্যমে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ভিত রচিত হওয়ার ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের যে উত্তর দিয়েছেন তা উপস্থাপন করছি, আমি যেমনটি বলেছি, এটি তার নিজের ভাষায় এবং পড়ার মতো একটি বিষয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এখানে চোখ মেলে দেখা উচিত যে, এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয়

বরং এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে, যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত, স্নেহশীল ও দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন এক মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ উন্নত, মহান, শ্রেষ্ঠ, অধিক উত্তম ও অধিক সম্পূর্ণ, কেননা মৃতকে জীবিত করার অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে একটি আত্মাকে ফিরিয়ে আনা। বাইবেলে হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্য কিছু নবী সম্পর্কেও এভাবে মৃতকে জীবিত করার কথা লেখা হয়েছে, যার প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীদের অনেক আপত্তিও রয়েছে। এছাড়া এসব যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিতর্কের পাশাপাশি এটিও লিখিত আছে যে, এমন মৃত মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যই জীবিত হতো আর এরপর পুনরায় নিজের আত্মীয়স্বজনকে অধিক শোকের সাগরে ভাসিয়ে এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করত। যার এ পৃথিবীতে আসার ফলে না পৃথিবীর কোন লাভ হতো, না সে নিজে কোন শান্তি পেতো, আর না তার আত্মীয়স্বজন কোন সত্যিকার আনন্দ পেতো। অতএব যদি হযরত ঈসা (আ.)এর দোয়ায় কোন আত্মা এসেও থাকে, তবুও তার আসা আর না আসা সমান ছিল। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এমন কোন আত্মা কোন দেহে কয়েক বছর অবস্থান করত, তাহলেও কোন হীন বা তুচ্ছ জগৎপুজারি ব্যক্তির দুর্বল আত্মা পৃথিবীর কীইবা উপকার সাধন করতে পারতো, যে নিজে একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নয়? অর্থাৎ পূর্বের এসব নবীদের আত্মা ফেরত আসলেও এবং কোন মৃতকে জীবিত করলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী আর তারা সাধারণ তুচ্ছ মানুষই হতো। এরপর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, ".....কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে এবং হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর কল্যাণে এই অধমের দোয়া কবুল করে এমন কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও এই নিদর্শন বাহ্যত মৃতকে জীবিত করার তুল্য বা সমান মনে হয় কিন্তু প্রণিধানে বোঝা যাবে যে, সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন মৃতকে জীবিত করার চেয়ে শত গুণ শ্রেয়। মৃতেরও কেবল আত্মাই দোয়ার মাধ্যমে ফিরে আসে, আর এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি রূহকে আনা হয়েছে। অর্থাৎ (সন্তানের জন্য) দোয়া করা হয়েছিল, আর দোয়ার মাধ্যমেই একটি রূহ আনা হয়েছে। কিন্তু সেসব রূহ বা আত্মা আর এই আত্মার মাঝে লক্ষ ক্রোশের ব্যবধান রয়েছে। মুসলমানদের মাঝে যারা লুক্কায়িত মুরতাদ রয়েছে, তারা মহানবী (সা.) এর নিদর্শনাদি দেখে আনন্দিত হয় না বরং ক্রুদ্ধ হয় যে, এমন কেন হলো? "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৪-১১৫, ইশতেহার ওয়াজেবুল ইযহার, ২২ মার্চ, ১৮৮৯ ইং)

তবলীগে রিসালত-এ তিনি (আ.) এই বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কোন সাধারণ রূহ্ এর জন্য দোয়া করা হয় নি। বরং একটি নিদর্শন চাওয়া হয়েছে। যার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বহু গুণাবলীর আধার এক পুত্রের সুসংবাদ দান করেছেন। এমন মহান সন্তানের সংবাদ দিয়েছেন যিনি দীর্ঘজীবি হবেন, অত্যন্ত মেধাবী আর বুদ্ধিমান হবেন, ঐশ্বর্যশালী ও মাহাত্ম্যের অধিকারী হবেন, জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে, তাকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হবে, কালামুল্লাহ্ অর্থাৎ কুরআনের সুগভীর জ্ঞান তাকে দান করা হবে, আর সেই খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি কুরআন সেবার এমন মহান সৌভাগ্য লাভ করবেন যে, আল্লাহ্র বাণীর মর্যাদা পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত হবে। তিনি বন্দিদের মুক্তির কারণ হবেন। তিনি **'আলমে কাবাব'** হবেন, অর্থাৎ তার যুগে এমন বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে যা সারা পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছারখার করবে। তিনি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবেন।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খন্ড, পৃ: ৫৩-৫৪)

আমরা জানি যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর যুগে বিশ্বব্যপী এমন ধ্বংসযজ্ঞ যুদ্ধের আকারেও এসেছে আর দুর্যোগের আকারেও এসেছে। অর্থাৎ দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। এছাড়া খ্যাতি লাভের যতটা সম্পর্ক আছে, তিনি তার জীবদ্দশায় নতুন মিশন প্রতিষ্ঠা আর তবলীগি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ইসলামের বাণী প্রচার করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতিও লাভ করেছেন। বরং আমরা দেখি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার নিদর্শন স্বরূপ সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। যেমনটি বলেছিলাম, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর জীবনী সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করব।

তার শিক্ষা-দীক্ষার যতটুকু সম্পর্ক আছে, কুরআন নাযেরা পড়ার পর রীতিমত স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রচলিত শিক্ষা অর্জনের তার সুযোগ হয়েছে। আর তারও চিত্র হলো, ঘরে তিনি শিক্ষকদের কাছে উর্দূ ও ইংরেজীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত পীর মনযূর আহমদ সাহেব (রা.) কিছুদিন তাকে উর্দূ পড়িয়েছেন। ঘরে এসে পড়ানোর জন্য যে গৃহশিক্ষকগণ নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের মাঝে পীর মনযূর আহমদ সাহেবওঅন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাকে কিছুদিন উর্দূ পড়িয়েছেন। এরপর কিছুদিন মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) তাকে ইংরেজী পড়িয়েছেন। কিন্তু এসব শিক্ষা কোন্ পরিবেশ ও কোন্ অবস্থার মাঝে হয়েছে তা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার অর্থাৎ খলীফা সানী (রা.)-র যে জীবনী লিখেছেন তাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এটিও একটি মজার ইতিহাস যা হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেবের নিজের ভাষায় এবং শোনার সাথে সম্পর্ক রাখে। তার শিক্ষাদীক্ষার চিত্র কীরূপ ছিল চলুন তা আমরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর নিজের ভাষাতেই শুনি। তিনি লিখেন, "আমার শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী হলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। তিনি যেহেতু হাকীমও ছিলেন, তাই তিনি জানতেন যে, আমার স্বাস্থ্য এমন নয় যে, আমি বেশিক্ষণ বইয়ের ওপর চোখ রাখতে পারি। এ কারণে তার রীতি ছিল, তিনি আমাকে নিজের কাছে বসিয়ে নিতেন আর বলতেন, মিয়া! আমি পড়ছি, তুমি শুনতে থাক। এর কারণ ছিল শৈশবে আমি চোখের ট্রাকোমায় আক্রান্ত ছিলাম। অর্থাৎ চোখের রোগ ছিল, আর ক্রমাগত তিন-চার বছর পর্যন্ত আমার চোখে ব্যথা হতে থাকে। চোখে এত ভয়াবহ কষ্ট দেখা দেয় যে, ডাক্তাররা ঘোষণা দেয়, এর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকেন আর একইসাথে রোযা রাখাও আরম্ভ করেন। তিনি (রা.) বলেন, এখন আমার মনে নেই তিনি (আ.) কয়টি রোযা রেখেছিলেন। যাহোক তিনি ৩ থেকে ৭টি রোযা রেখে থাকবেন। যখন তিনি শেষ রোযার ইফতারি করতে যাচ্ছিলেন আর রোযা খোলার জন্য কোন কিছু মুখে নিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আমি চোখ খুলি আর বলে উঠি যে, আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই রোগের প্রবলতা এবং এর লাগাতার হামলার ফলে আমার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে আমার বামচোখে কোন দৃষ্টিশক্তি নেই। আমি পথ দেখি কিন্তু বই পড়তে পারি না। দু-চার ফুট দূরে কোন পরিচিত মানুষ বসে থাকলে আমি তাকে চিনতে পারি। কিন্তু কোন অপরিচিত ব্যক্তি বসে থাকলে আমি তার চেহারা দেখতে পাই না। শুধু ডানচোখ কাজ করে। কিন্তু তাতেও ট্রাকোমা দেখা দিয়েছে। আর তা এত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে যে, উপর্যুপরি কয়েক রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটাতাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার শিক্ষকদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পড়ালেখা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। সে যতটা পড়তে চায় পড়বে, তার ওপর যেন চাপ প্রয়োগ করা না হয়, কেননা তার স্বাস্থ্য পড়ালেখার চাপ সহ্য করার শক্তি রাখে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাকে শুধু এটিই বলতেন যে, তুমি কুরআনের অনুবাদ এবং বুখারী হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে পড়ে নাও, অর্থাৎ মওলানা নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালে (রা.)-এর কাছে। এছাড়া তিনি আমাকে এটিও বলেছিলেন যে, কিছুটা তিব্ব বা চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়ে নিও, কেননা এটি আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, মাষ্টার ফকিরুল্লাহ্ সাহেব আমাদের স্কুলে গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের বোঝানোর জন্য তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে তা আমি দেখতে পেতাম না, কেননা বোর্ড পর্যন্ত আমার দৃষ্টি পৌঁছত না। এছাড়া এমনিতেও আমি বোর্ডের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারতাম না, কেননা চোখ অবসন্ন হয়ে পড়তো। এ কারণে আমি ক্লাসে বসা বৃথা কাজ মনে করতাম। তাই কখনো ইচ্ছা হলে যেতাম, আর কখনো যেতাম না। মাষ্টার ফকিরুল্লাহ্ সাহেব একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, হুযূর! সে কিছুই পড়ে না। কখনো ইচ্ছা হলে মাদ্রাসায় আসে আবার কখনো আসে না। তিনি (রা.) লিখেন, আমার মনে আছে যে, মাষ্টার সাহেব যখন মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে এই অভিযোগ করেন তখন আমি এই ভয়ে পালিয়ে যাই যে, জানা নেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এখন কী পরিমাণ অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এ কথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মাষ্টার সাহেবকে বলেন, এটি আপনার বড় অনুগ্রহ যে, আপনি শিশুদের বিষয়ে যত্নবান, আপনার কথায় আমি আনন্দিত হয়েছি যে, সে কখনো কখনো মাদ্রাসায় যায়। (অর্থাৎ এটি খুব ভালো কথা যে, সে কখনো কখনো মাদ্রাসায় যায়।) নতুবা আমার মতে তার স্বাস্থ্য পড়াশোনা করার মতো নয়। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৃদু হেসে বলেন যে, আমরা কি তাকে দিয়ে চাল-ডালের ব্যবসা করাব যে, তাকে অঙ্ক শিখাতে হবে। সে গণিত পারুক বা না পারুক, তাতে কোন অসুবিধা নেই। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কি কোন গণিত শিখেছিলেন?সে যদি মাদ্রাসায় যায় তাহলে ভালো কথা, নতুবা তাকে বাধ্য করা উচিত নয়। এ কথা শুনে মাষ্টার সাহেব ফিরে যান, আর আমি আরো বেশি এই নমনীয়তার সুযোগ নিতে থাকি এবং এরপর মাদ্রাসায় যাওয়াই ছেড়ে দিই। কখনো কখনো মাসে কেবল দুএকবার যেতাম। মোটকথা এভাবেই আমি লেখাপড়া করেছি। আর বাস্তবে আমি নিরুপায়ও ছিলাম, কেননা শৈশবে চোখের ব্যাধির পাশাপাশি আমি যকৃতের রোগেও আক্রান্ত ছিলাম। যকৃতের চিকিৎসার জন্য অনবরত ছয় মাস আমাকে

মুগডাল বা শাকের পানি খাওয়ানো হতো। একইসাথে প্লীহাও বড় হয়ে যায়। আর প্লীহার ওপর রেড আয়োডাইড অফ মার্কারি মালিশ করা হতো। অনুরূপভাবে গলাতেও তা মালিশ করা হতো, কেননা আমার গলগণ্ড রোগ অর্থাৎ টনসিলের ব্যাধি ছিল। বস্তুত চোখের ট্রাকোমা, যকৃতের রোগ, প্লীহার কষ্ট, একইসাথে জ্বর আরম্ভ হওয়া, যা অনেক সময় ছয় মাস পর্যন্ত নামতো না, আর আমার পড়ালেখা সম্পর্কে বুযুর্গদের এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া যে, সে যতটা পড়তে চায় পড়ুক, তার ওপর যেন চাপ প্রয়োগ করা না হয়- এ অবস্থায় সবাই অনুমান করতে পারে যে, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার অবস্থা কেমন হবে।"

তিনি বলেন-"একবার আমাদের নানা মীর নাসের নবাব সাহেব (রা.) আমার উর্দূর পরীক্ষা নেন।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)বলেন, "আমার হাতের লেখা এখনও খুবই খারাপ, (অর্থাৎ আমার হাতের লেখা ভালো নয়) কিন্তু সে যুগে আমার হাতের লেখা এতটাই খারাপ ছিল যে, আমি কি লিখেছি তা পড়া-ই যেতো না। আমি কি লিখেছি তা উদঘাটনের তিনি অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন নি। তিনি বলেন, আমার অধিকাংশ সন্তান-সন্ততির হাতের লেখা আমার চেয়ে ভালো। (তিনি তার এক কন্যার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন) শুধু আমার মেয়ে আমাতুর রশীদ এর লেখার সাথেই আমার লেখার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তার লেখা সম্পর্কে আমরা এক রুপি পুরস্কারও নির্ধারণ করেছিলাম যে, স্বয়ং আমাতুর রশীদও যদি পড়ে বলতে পারে যে, সে কি লিখেছে তাহলে তাকে এক রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে।" তিনি বলেন, "তখন আমার নিজের অবস্থাও অনুরূপই ছিল। অনেক সময় আমার নিজের লেখা আমার দ্বারাই পড়া সম্ভব হতো না।" তিনি বলেন, "মীর সাহেব খাতা দেখে রেগে যান এবং বলেন, এটি তো কিছু আঁকাবাকা লাইন বই কিছু নয়। তিনি খুব রাগী স্বভাবের ছিলেন। উত্তেজনার সাথে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে পৌঁছে যান। ঘটনাচক্রে আমিও তখন ঘরেই ছিলাম। তিনি যেহেতু খুবই রাগী স্বভাবের ছিলেন, আর আমরা পূর্বেই তার মেজাজকে ভয় করতাম, তাই তিনি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসেন তখন আমার আরো বেশি ভয় হয় যে, জানি না এখন কী হবে!" তিনি বলেন, "যাহোক মীর সাহেব এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন যে, মাহমুদের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে আপনি মোটেই চিন্তিত নন। আমি তার উর্দূ পরীক্ষা নিয়েছিলাম। আপনি তার খাতাটা একটু দেখুন। তার হাতের লেখা এত বিশ্রি যে, এই লেখা কেউ পড়তে পারবে না। একই উত্তেজনার সাথে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, আপনার কোন চিন্তাই নেই যে, এই ছেলের জীবন নষ্ট হচ্ছে। মীর সাহেবকে এমন উত্তেজিত দেখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,"হযরত মৌলভী সাহেবকে ডাক।" তিনি বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখনই কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তখন সবসময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) কে ডেকে পাঠাতেন। খলীফা আউয়াল (রা.) আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি আসেন এবং বরাবরের মত অবনত মস্তকে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, মৌলভী সাহেব! আপনাকে আমি এই উদ্দেশ্যে ডেকেছি যে, মীর সাহেব বলছেন, মাহমুদের হাতের লেখা পড়া যায় না। আমার মতে তার পরীক্ষা নেওয়া হোক।" এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কলম নিয়ে দুতিন বাক্যের ছোট একটি অনুচ্ছেদ লিখে আমাকে দেন এবং বলেন যে, এটি দেখে দেখে লেখ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ছিল মোট পরীক্ষা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিয়েছেন। আমি খুব সাবধানতার সাথে এবং ভেবেচিন্তে সেই লেখার অনুলিপি করি। প্রথমত এই বাক্যগুচ্ছ খুব একটা দীর্ঘ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত আমার কাজ ছিল শুধু অনুলিপি করা। এছাড়া দেখে দেখা লেখা তো আরো সহজ, কেননা মূল লেখা তখন সামনেই থাকে। অধিকন্তু আমি ধীরে ধীরে অনুলিপি করি, 'আলিফ,বা' ইত্যাদি সাবধানতার সাথে লিখি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা দেখে বলেন, মীর সাহেবের কথা শুনে তো আমি বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এর হাতের লেখা তো আমার হাতের লেখার মতোই। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) পূর্বেই আমার সমর্থনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, হুযূর! মীর সাহেব অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন, এর লেখা তো খুব ভালো।

হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) আমাকে সবসময় বলতেন যে, মিয়া! তোমার স্বাস্থ্য এমন নয় যে, তুমি নিজে পড়তে পারবে। তাই আমার কাছে চলে এসো, আমি পড়বো আর তুমি শুনতে থেকো। অতএব তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রথমে কুরআন পড়ান, এরপর বুখারী পড়িয়ে দেন। আরএমন নয় যে, তিনি আমাকে ধীরে ধীরে কুরআন পড়িয়েছেন, বরং তার পড়ানোর রীতি ছিল তিনি কুরআন পড়ে সাথে সাথে অনুবাদ পড়তেন, আর কোন কিছু প্রয়োজনীয় মনে করলে তা বলে দিতেন, নতুবা দ্রুততার সাথে পড়তে থাকতেন। তিনি তিন মাসে আমাকে পুরো কুরআন পড়িয়ে দেন। এরপর কখনো কখনো পড়া বন্ধ থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ইন্তেকালের পর খলীফা আউয়াল (রা.) পুনরায় আমাকে বলেন যে, মিয়া! আমার কাছে পুরো বুখারী তো অন্তত পড়ে নাও। সত্যিকার অর্থে আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, মৌলভী সাহেবের কাছে কুরআন এবং বুখারী পড়ে নাও। সে অনুসারে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জীবদ্দাশাতেই তার কাছে কুরআন এবং বুখারী পড়া আরম্ভ করি। যদিও মাঝে মাঝে বাদ পড়তো। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নির্দেশ অনুসারে আমি তার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়া আরম্ভ করি। আমি এবং মীর ইসহাক সাহেব একই দিনে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ নেওয়া আরম্ভ করি। মীর সাহেব সংক্রান্ত একটি কৌতুক আমাদের ঘরে খুবই প্রসিদ্ধ, সেটি হলো-তারা উভয়ে প্রথম দিনের পাঠ নেওয়ার পর দ্বিতীয় দিনই মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব নিজের মাকে বলেন যে, আম্মাজান! আমাকে সকালে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ডেকে দিবেন,কেননা মৌলভী সাহেব তার দাওয়াখানায় দেরিতে আসেন, তাই আমি আগেই দাওয়াখানায় চলে যাব, যেন রোগীদের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতে পারি। অথচ তিনি মাত্র একদিনই চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি তার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়েছি, আর কুরআনের তফসীরও পড়েছি। কুরআনের তফসীর তিনি দুই মাসে পড়িয়ে শেষ করেন। তিনি আমাকে তার কাছে বসিয়ে নিতেন আর কখনো অর্ধেক এবং কখনো পুরো পারা অনুবাদসহ শুনাতেন। কোন কোন আয়াতের তফসীরও করতেন। একবার রমজান মাসে তিনি পুরো কুরআনের দরস প্রদান করেন। তাতেও আমি অংশগ্রহণ করি। কয়েকটি আরবী পুস্তিকাও তার কাছে পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। বস্তুত এই ছিল আমার মোট পড়াশোনা। যখন আমি এই কোর্স শেষ করছিলাম, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা ছিল জ্ঞানের জগতে তার বুৎপত্তি সংক্রান্ত।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর,১ম খণ্ড, পৃ: ১০৪-১০৯)

অতএব এ ছিল তার জ্ঞানগত অবস্থা বা কিভাবে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন তার চিত্র। কিন্তু তার বক্তৃতা, ভাষণ, রচনাবলী আর কুরআনের তফসীর এই কথার সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে পড়িয়েছেন। নিশ্চয় এটি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জীবদ্দশায় ১৯০৬ সনে যে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়েছে,তাতে তিনি প্রথমবার জনসমক্ষে বক্তৃতা করেন। শ্রোতাদের ওপর সেই বক্তৃতায় অন্তর্নিহিত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাব, আর তখন তাদের ওপর বিরাজমান অবস্থার ধারণা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সম্মানিত সাহাবী ও বাগ্মী কবি হযরত কাজী মুহাম্মদ যহুর উদ্দীন আকমল সাহেবের নিম্নলিখিত বাক্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। তিনি বলেন, নবুয়্যতরূপী সৌরজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং রিসালতের জগতের উজ্জ্বল রত্ন স্নেহভাজন মাহমুদ, আল্লাহ্ তার নিরাপত্তা বিধান করুন, শিরক সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য মঞ্চে দণ্ডায়মান হয়। আমি বিশেষ মনোযোগের সাথে তার বক্তৃতা শুনতে থাকি। কী বলব, বাগ্মিতার এক বন্যা ছিল যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। সত্যিই এত ছোট বয়সে চিন্তাধারার এমন পরিপক্কতা নিদর্শনের চেয়ে কম নয়। আমার মতে এটিও হুযূর (আ.) এর সত্যতারই একটি নিদর্শন। এটি থেকে বোঝা যায় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এর তরবীয়তের প্রভাব কোন্ পরাকাষ্ঠায় উপনীত ছিল। তিনি (রা.) আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বিস্ময়কর আঙ্গিকে আলোচনা করেন।

(আল হাকাম, ১০ জানুয়ারী, ১৯০৭ ইং, জুবিলি নম্বর-১৯৩৯) (সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২১-১২২)

সেযুগে তার ধর্মীয় কর্মব্যস্ততা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, আর মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা বলছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য "সে দ্রুত বড় হবে" এর তিনিই সত্যায়নস্থল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও ধর্মের জন্য তার এই উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা অনুভব করেছেন। যেমন একবার তিনি বলেন, মিয়া মাহমুদের মাঝে এতটা ধর্মীয় উদ্দীপনা ও উচ্ছাস বিদ্যমান যে, আমি অনেক সময় তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করি। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬)

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর শব্দ। আর নিশ্চয় তিনি এই দোয়া করে

যুগ ইমামের বাণী

যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহা হইলে মার খাইয়াও তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে, গালি শুনিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

থাকবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে সেই সন্তান বানিয়ে দেন যার সম্পর্কে পূর্বে সংবাদ দেওয়া হয়েছে আর তার ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন। আর সকল শুভ সংবাদ তার পক্ষে পূর্ণ হোক।

দ্বিতীয় খলীফার ইন্তোকালের পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তার যে জীবনি লিখেছেন তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেন, প্রথম খিলাফতের প্রারম্ভে হযরত সাহেবযাদা সাহেবের বয়স ছিল ১৯ বছর আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের তিরোধানের সময় তিনি তার বয়সের ২৬ তম বছরে পদার্পন করেন। এই অল্প বয়সে তার রচনা ও বক্তৃতার যে ধরন ও বৈশিষ্ট্য ছিল- তার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। তার ধ্যানধারণা এবং চিন্তাধারার মাঝে একজন অভিজ্ঞ চিন্তাবিদের পরিপক্কতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তার কথা প্রভাব বিস্তার ও আবেদন সৃষ্টি আর নিষ্ঠা ও আত্মবিলীনতার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। কৃত্রিমতা কাকে বলে তা তার উক্তি জানতো না। আর লেখা ছিল ভণিতামুক্ত। বক্তৃতায় এক সহজাত সাবলীলতা ছিল এবং রচনা ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন স্রোতস্বিনীর মতো। উভয়টি কুরআনের জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের পানিতে সমৃদ্ধ ছিল আর অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর ১৯ বছর বয়সে তিনি যে প্রথম বক্তৃতা করেছেন, সেটি সম্পর্কে জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এক বুযুর্গ হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, আরেকটি ঘটনার কথা আমি এ প্রবন্ধে উল্লেখ করতে চাই, আর তাহলো- হুযূর (রা.) এর প্রথম বক্তৃতা, যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ইন্তেকালের পর প্রথম জলসা সালানায় প্রদান করেছেন। মৌলভী সাহেব তখনো জীবিত ছিলেন। এই জলসা মাদ্রাসা আহমদীয়ার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মঞ্চে হুযূরের ডান পাশে শোভা পাচ্ছিলেন। আর মঞ্চটি ছিল উত্তরমুখী। মৌলভী শের আলী সাহেব বলেন, এই বক্তৃতা সম্পর্কে দুটো কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তখন তার কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গি, তার উচ্চারণ এবং বক্তৃতার রীতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কণ্ঠস্বর এবং বক্তৃতার রীতি-পদ্ধতির সাথে এত গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে, শ্রোতাদের হৃদয়পটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর স্মৃতি জাগ্রত হয়, যিনি মাত্র স্বল্পকাল পূর্বেই আমাদের ছেড়ে গেছেন। শ্রোতাদের অনেকেই এমন ছিল যাদের চোখ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর এই কণ্ঠস্বর শুনে অশ্রুধারা নেমে আসে, যা তখন তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্রের মুখ থেকে সেভাবে আসছিল যেভাবে এক অদৃশ্য ব্যক্তির আওয়ায গ্রামোফোনের মাধ্যমে পৌঁছে থাকে। সেই অশ্রু বিসর্জনকারীদের মাঝে একজন এই অধমও ছিল। যদি এই কথা বলা সঠিক হয় যে, মানুষের রূহ অন্যের ওপর অবতরণ করে থাকে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আত্মা তার ওপর নাযেল হচ্ছিল। আর এই ঘোষণা দিচ্ছিল যে, এই হলো আমার প্রিয় পুত্র, যাকে রহমতের নিদর্শন স্বরূপ দান করা হয়েছে। আর যার সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সে সৌন্দর্য ও পুণ্যকর্মে তোমার নজির বা দৃষ্টান্ত হবে।

এই বক্তৃতা সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কথা হলো,বক্তৃতার সমাপান্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), যার সারাটি জীবন কুরআন সম্পর্কে প্রণিধানে অতিবাহিত হয়েছে এবং যার আত্মার খোরাক ছিল কুরআন, তিনি বলেন, মিয়া সাহেব অনেক আয়াতের এমন তফসীর করেছেন যা আমার জন্যও নতুন ছিল। মৌলভী সাহেব লিখেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর এটি তার প্রথম বক্তৃতা ছিল যা তিনি জামা'তের সামনে করেছেন। আর এই প্রথম বক্তৃতায় কুরআন শরীফের এমন তত্ত্বজ্ঞান তিনি বর্ণনা করেছেন যা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর মতো কুরআনের আলেমও স্বীকার করেছেন যে, এগুলো তার জন্যও নতুন। অতএব এই তত্ত্বজ্ঞান সেই যুবককে কে শিখিয়েছে, এই প্রজ্ঞা আর এই জ্ঞান যৌবনের সেই দিনগুলোতে তাকে কে দিয়েছে? তিনিই যিনি কুরআন শরীফে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলেছেন,

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيۡنٰهُ حُكۡمًا وَّعِلۡمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ (সূরা ইউসুফ: ২৩)

অর্থাৎ আর সে যখন তার পরিপক্কতার বয়সে উপনীত হলো তখন আমরা তাকে বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। মৌলানা শের আলী সাহেব বলেন, তিনি শুধু সাধারণভাবে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পর্কেই কথা বলেন নি বরং কুরআনের অভূতপূর্ব তত্ত্বজ্ঞান তুলে ধরেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন সম্পর্কে বলেন, لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الۡمُطَهَّرُوۡنَ (সূরা আল ওয়াকেআ: ৮০) অর্থাৎ যাদের পবিত্র করা হয়েছে তারা ব্যতীত এটিকে আর কেউ স্পর্শও করতে পারে না। তিনি বলেন, কৈশোরের নির্জন দিনগুলো পার হতেই কুরআন শরীফের এমন নতুন ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান মানুষের সামনে বর্ণনা করা এ কথার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি তার শৈশব আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত করেছেন। আর তিনি শৈশবেই পবিত্রদের জামা'তভুক্ত ছিলেন।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৭-২১৭)

তার সীরাত সম্পর্কে এক অ-আহমদী সাংবাদিকের অভিব্যক্তি রয়েছে। সেই সাংবাদিকের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেন, ১৯১৩ সনের মার্চ মাসে একজন অ-আহমদী সাংবাদিক মুহাম্মদ আসলাম সাহেব অমৃতসর থেকে কাদিয়ানে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থানের পর ফিরে যান। জামা'তকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, আর তাতে হযরত সাহেবযাদা সাহেব সম্পর্কে লিখেছেন যে, সাহেবযাদা মাহমুদ আহমদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা যারপরনায় আনন্দিত হয়েছি। সাহেবযাদা সাহেব অত্যন্ত অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং সরলতা প্রিয় ও সদাচারী হওয়ার পাশাপাশি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিজীবিও বটে। অন্যান্য কথার পাশাপাশি সাহেবযাদা সাহেব এবং আমার মাঝে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আলোচনা হয়, আর এ সম্পর্কে সাহেবযাদা সাহেব অতীতের বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলীর আলোকে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা খুবই উন্নত মানের সুচিন্তিত দিক সম্বলিত ছিল। এটি ১৯১৩ সনের তথা (দ্বিতীয়) খিলাফতের পূর্বের কথা। খলীফা আউয়ালের যুগের কথা। পুণরায় তিনি লিখেন, "সাহেবযাদা সাহেব আন্তরিকভাবে এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, আমি যেন অন্তত এক সপ্তাহ কাদিয়ানে অবস্থান করি। যদিও আমি তার কথা শিরোধার্য করতে ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু সাহেবযাদা সাহেবের এই উচ্চমানের দয়ার্দ্র ও স্নেহপূর্ণ উপঢৌকনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সাহেবযাদা সাহেবের তাকওয়া ও খোদাভীতি আর চিন্তাচেতনার বিশালতা এবং সরলতা আমার সদা স্মরণ থাকবে।"

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৪)

শৈশবেই তার ইবাদতের চিত্র কেমন ছিল এ সম্পর্কে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব, যিনি তার শিক্ষকও ছিলেন, নিজ অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, এই অধম যেহেতু ১৮৯০ এর শেষের দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছিল আর তখন থেকেই সবসময় আসা যাওয়া অব্যাহত ছিল, তাই আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে শৈশব থেকেই দেখে আসছি যে, লজ্জাবোধের অভ্যাস, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা ও ধর্মের দিকে তার মনোযোগ আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ধর্মীয় কাজে শৈশব থেকেই তার আগ্রহ কেমন ছিল। প্রায়শ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে নামাযের জন্য জামে মসজিদে যেতেন আর খুতবা শুনতেন। আমার মনে পড়ে, একবার যখন তার বয়স দশ বছরের কাছাকাছি হবে, তখন তিনি মসজিদে আকসায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন আর সিজদায় অনেক কাঁদছিলেন। আশৈশব প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলদের সাথে তার বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৬-১১৭)

তার আকুতি-মিনতি এবং সেজদায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকা সংক্রান্ত আরো একটি ঘটনা রয়েছে যা দেখে জ্যেষ্ঠরাও আশ্চর্যান্বিত হতেন। আর বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন কিনা জ্যেষ্ঠরা জানেন যে, বাহ্যত তেমন কোন মনোবেদনাও নেই, তখন বড়রা তার আহাজারি দেখে আশ্চর্য হতেন আর প্রশ্ন জাগতো যে, এই বালকের কী হয়েছে যে, সে রাতে সংগোপনে জাগ্রত হয় এবং নিজ প্রভুর সন্নিধানে আহাজারির সাথে ক্রন্দন করে আর নিজের নিষ্পাপ অশ্রু দ্বারা সেজদাস্থলকে সিক্ত করে।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রাহে.) যে জীবনী লিখেছেন, তাতে তিনি লিখেন, একই বিস্ময়ানুভূতি শেখ গোলাম আহমদ ওয়ায়েজ সাহেবের হৃদয়েও জাগ্রত হয়েছে, যিনি একজন নবমুসলিম ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিষ্ঠা ও ঈমানের ক্ষেত্রে এত উন্নতি করেন যে, গভীর ইবাদতগুযার, খোদাভীরু, দিব্যদর্শন ও এলহামে অভিজ্ঞ বুযুর্গদের মাঝে গণ্য হতেন। শেখ গোলাম আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি সংকল্প করি যে, আজকের রাত মসজিদ মোবারক-এ অতিবাহিত করব আর নির্জনে আমার প্রভুর কাছে যা ইচ্ছা হয় যাচনা করব। তিনি বলেন, মসজিদে পৌঁছে আমি দেখি যে, কোন ব্যক্তি সেজদারত রয়েছে আর কাতরচিত্তে দোয়া করছে। এমনকি তার অনুনয় বিনয়ের কারণে আমি নামাযও পড়তে পারি নি এবং আমার ওপর সেই ব্যক্তির দোয়ার প্রভাব ছেয়ে যায়। আর আমিও দোয়ায় মগ্ন হয়ে যাই। আমি দোয়া করি যে, হে প্রভু! এ ব্যক্তি তোমার কাছে যা কিছু যাচনা করছে তুমি তাকে তা প্রদান কর। আর আমি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে যাই যে, এই ব্যক্তি সেজদা থেকে মাথা তুললে দেখব যে, সে কে? তিনি বলেন, আমার জানা নেই যে, আমার আসার কত পূর্বে তিনি এসেছেন। কিন্তু তিনি যখন মাথা তুললেন তখন দেখি যে, তিনি হযরত মিয়া মাহমুদ আহমদ সাহেব। আমি আসসালামু আলাইকুম বলি এবং করমর্দন করি আর জিজ্ঞেস করি যে, মিয়া! আজকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কী কী চেয়ে নিয়েছ? তিনি বলেন, আমি তো এ যাচনাই করেছি যে, হে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 4 April, 2019 Issue No.14

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমার প্রভু! তুমি আমার চোখের সামনে ইসলামকে জীবিত করে দেখাও। আর এ কথা বলে তিনি ভিতরে চলে যান। ইসলামের বিজয়লগ্ন দেখার যে ব্যকুল বাসনা সেই স্বল্প বয়সে তার হৃদয়ে বিরাজমান ছিল, তা সেই বয়সেই ফল বহন করা আরম্ভ করে, যখন আল্লাহ্ তা'লা যৌবনেই তাকে খিলাফতের পোশাক পরিধান করান।

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫১)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব তাশহিযুল আযহান পত্রিকায় তার এক দোয়ার কথা উল্লেখ করেন,যা তিনি ১৯০৯ সনে লিখেছেন। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন। সেই প্রবন্ধে রমযানের কল্যাণরাজির কথা উল্লেখ করার পর তিনি লিখেন, আমি তাশহিযুল আযহান পত্রিকার জন্য আমার টেবিলে একটি প্রবন্ধের সন্ধান করছিলাম। এমন সময় আমি একটি কাগজ খুঁজে পাই যা ছিল গত রমযানে লেখা আমার একটি দোয়া সম্বলিত। এই দোয়া পড়ে আমার গভীর অনুপ্রেরণা জাগে যে, বন্ধুদের মনোযোগও এদিকে আকর্ষণ করি। বলা যায় না কার দোয়া গৃহীত হবে আর খোদার কৃপা কখন আমাদের জামা'তের ওপর একটি বিশেষ রূপে অবতীর্ণ হবে। আমি আমার হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের জন্য এই দোয়া এখানে লিপিবদ্ধ করছি। হয়ত কোন নেক প্রকৃতির মানুষ এতে উদ্বুদ্ধ হবে আর সে স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে নিজের জন্য এবং জামা'তের জন্য দোয়ায় রত হবে, যা আমার মূল উদ্দেশ্য। সেই দোয়াটি হলো-

"হে আমার মালিক, আমার সর্বশক্তিমান খোদা, আমার প্রিয় প্রভু, আমার পথের দিশারী, হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে জলবায়ুর নিয়ন্তা, হে সেই খোদা, যিনি আদম থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পথপ্রদর্শক ও কোটি কোটি পথের দিশারীকে পৃথিবীবাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন, হে সেই মহান ও গরিয়ান সত্তা, যিনি মহানবী (সা.) এর মতো অসাধারণ রসূলকে প্রেরণ করেছেন, হে রহমান, যিনি মহানবী (সা.) এর দাসদের মাঝে মসীহ্র মতো পথপ্রদর্শক সৃষ্টি করেছেন, হে নূরের স্রষ্টা, হে অন্ধকার বিমোচনকারী! তোমার দরবারে, হ্যাঁ, শুধু তোমারই দরবারে আমার মতো অসহায় বান্দা বিনত হয় এবং নিবেদন করে যে, আমার ডাকে সাড়া দাও এবং গ্রহণ কর, কেননা তোমার প্রতিশ্রুতিই আমাকে তোমার সামনে কিছু নিবেদন করার সাহস জুগিয়েছে। আমাকে তুমি শূন্য থেকে বানিয়েছ। আমাকেঅনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছ। আমার লালন পালনের জন্য চারটি মৌলিক উপাদান সৃষ্টি করেছ। আর আমার খবরাখবর রাখার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছ। যখন আমি আমার চাহিদার কথা বলতেও পারতাম না, তুমি আমার জন্য এমন মানুষ সৃষ্টি করেছ যারা নিজেরাই আমার জন্য চিন্তিত থাকত। এরপর আমাকে উন্নতি দিয়েছ আর আমার রিযককে বিস্তৃত করেছ। হে আমার প্রাণ, হ্যাঁ, হে আমার প্রাণ! তুমি আদমকে আমার পিতা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছ আর হওয়াকে আমার মা নিযুক্ত করেছ। আর স্বীয় দাসদের মধ্য থেকে এক দাসকে, যে তোমার সন্নিধানে সম্মানজনক মর্যাদা রাখতো, এজন্য নিযুক্ত করেছ যেন তিনি আমার মতো অবুঝ, নির্বোধ এবং স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির জন্য তোমার দরবারে সুপারিশ করেন আর আমার জন্য তোমার কৃপাকে আকর্ষণ করেন। আমি গুনাহগার ছিলাম, তুমি আমার পাপ ঢেকে রেখেছ। আমি ভ্রান্তিতে ছিলাম, তুমি আমার ভুলভ্রান্তি গোপন রেখেছ। প্রতিটি দুঃখ কষ্টে আমায় সঙ্গ দিয়েছ। যখনই আমি সমস্যা কবলিত হয়েছি, তুমি আমার সাহায্য করেছ। আর যখনই আমি ভ্রষ্টতার দ্বারপ্রান্তে ছিলাম, তুমি আমার হাত ধরেছ। আমার সব অনাচার সত্ত্বেও তুমি তা উপেক্ষা করেছ। আমার দূরে চলে যাওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার কাছে এসেছ। আমি তোমার নাম সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় স্মরণ রেখেছ। যখন পিতামাতা, নিকট আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সমব্যাথীরা সাহায্য করতে অপারগ থাকে, এমন স্থান ও সময়ে তুমি তোমার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছ আর আমায় সাহায্য করেছ। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হলে তুমি আমায় আনন্দিত করেছ। আমি বিষন্ন হলে তুমি প্রফুল্লচিত্ত করেছ। আমি কাঁদলে তুমি আমাকে হাসিয়েছ। হয়ত এমনও কেউ থাকবে যে বিরহে আকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু আমাকে তো তুমি নিজেই নিজের দর্শন দিয়েছ। তুমি আমাকে কথা দিয়েছ আর কথা রেখেছ। কখনো এমন হয় নি যে, তুমি অঙ্গীকার রক্ষায় ত্রুটি করেছ। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কিন্তু ভঙ্গ করেছি। অথচ তুমি তা হিসাবের আওতায় আন নি। আমি মনে করি না যে, আমার চেয়ে বেশি গুনাহগারও কেউ থাকবে। কিন্তু আমার এটিও জানা নেই যে, আমার চেয়ে বেশি অন্য কারো প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন করে থাকবে। কারো কল্পনা ও ধারণার জগতেও এ কথা স্থান পেতে পারে না যে,কেউতোমার চেয়ে বেশি স্নেহশীল হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, তোমার মতো স্নেহশীল কেউ হবে,এটি ধারণা ও কল্পনারও ঊর্ধ্বে। যখন আমি তোমার দরবারে এসে কাকুতিমিনতির সাথে আহাজারি করেছি, তুমি আমার ক্রন্দন শুনেছ এবং গ্রহণ করেছ। আমার ব্যাকুলচিত্তের দোয়া কখনো তুমি রদ করেছ বলে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। অতএব হে আমার খোদা! আমি অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে এবং সত্যিকার উৎকণ্ঠা নিয়ে তোমার দরবারে বিনত হই এবং সেজদা করি আর নিবেদন করি যে, আমার দোয়া শুন এবং আমার ডাকে সাড়া দাও। হে আমার পবিত্র খোদা! আমার জাতি ধ্বংস হচ্ছে। তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর। যদি তারা আহমদী হওয়ার দাবি করে তাহলে যতক্ষণ তাদের হৃদয় ও বক্ষ পরিষ্কার না হবে তাদের সাথে আমার কিইবা সম্পর্ক? তোমার ভালোবাসায় যদি তারা আপ্লুত না হয় তাহলে তাদের সাথে আমার কী কাজ? অতএব হে আমার প্রভু! তোমার রহিমিয়্যত ও রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছলিত কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর। সাহাবীদের মতো উদ্দীপনা আর উচ্ছ্বাস যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। তারা যেন তোমার ধর্মের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। তাদের কর্ম যেন তাদের কথা থেকে অধিক উন্নত এবং স্বচ্ছ হয়। তারা যেন তোমার প্রিয় মুখের জন্য আত্মবিলীন করে এবং মহানবী (সা.) এর জন্য নিবেদিত হয়। তোমার মসীহ্র দোয়া তাদের পক্ষে গৃহীত হোক। তার পবিত্র এবং সত্য শিক্ষা তাদের অন্তঃকরণে ঠাই পাক। হে আমার খোদা! আমার জাতিকে সকল পরীক্ষা ও দুঃখ বেদনা থেকে রক্ষা কর এবং সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখ। তাদের মাঝে বড় বড় পুণ্যবান মানুষ সৃষ্টি কর। তারা এমন এক জাতিসত্তায় পরিণত হোক যারা তোমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে। আর তারা এমন এক জামা'তে পরিণত হোক যাদেরকে তুমি নিজের জন্য বিশেষভাবে বেছে নিবে। তারা শয়তানের আধিপত্য থেকে নিরাপদ থাকুক। আর সবসময় তাদের ওপর ফেরেশতা নাযেল হোক। এই জাতিকে ইহ ও পরকালে আশিসমণ্ডিত কর। আমীন, সুম্মা আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন। "

(সোয়ানেহ ফযলে উমর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১২)

আমি যেভাবে বলেছি এটি ১৯০৯ সনের দোয়া। খিলাফত লাভের পূর্বে যখন তার বয়স কেবল ২০ বছর ছিল, তখনও তার হৃদয়ে ধর্ম এবং জাতির জন্য এক বেদনা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আত্মার প্রতি সহস্র সহস্র রহমত বর্ষণ করুন। তিনি মহানবী (সা.) এর ধর্মের প্রসার এবং তাঁর নিষ্ঠাবান দাস মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য রাতদিন কাজ করে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার এই বেদনাভরা দোয়া বোঝার এবং আহমদীয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন।

****

আল্লাহ্র বাণী

"এবং আকাশে তোমাদের রিযক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। (আয যারিয়া, আয়াত: ২৩)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্র বাণী

বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।

(আয যারিয়া, আয়াত: ২০)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir